বাজু কুরুং

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

সমাজের পাতায় পাতায় নিত্য লিখিত হয় অগণিত কাহিনী। প্রেম-প্রীতি, দুঃখ-বেদনা, বিরহ-মিলন, হাসি-কান্না, সংস্কার-কুসংস্কার আর শহুরে ও গ্রামীণ সমাচারের শতসহস্র জীবনগাঁথা। কাল ও জীবনস্রোতের প্রবল প্রবাহে তা হারিয়ে যায়। আকাশে বাতাসে তা গুঞ্জরিত হয় অবিরত। কেউ তা বোঝে, কেউ বোঝে না। প্রকৃতির অতলান্ত অজানা গহ্বরে রয়ে যায় তা রহস্যাবৃত। লেখক নিজ তুলিতে এঁকেছেন এমনি বিশটি চিত্র, যা প্রকাশ পেয়েছে বিশটি ছোটগল্পে। অত্যন্ত সহজ, সাবলীল, প্রাঞ্জল ও গতিশীল ভাষায়। গল্প পড়লে মনে হয়, ঘটনাটি যেন চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে। নারীর মায়া স্থান ও কালের সীমা মানে না। 'বাজু কুরুং' গল্পে ভেসে উঠেছে তেমনি এক বিদেশীনীর মায়ার ছায়া। মানবমনের আবহমান এক কোমল হৃদয়চিত্র। গল্পের কাহিনী, ভাষা ও চিত্রায়ন মন ও হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

বাজু কুরুং

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

কথামালা

বাজু কুরুং

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

©

কথামালা
২য় সংস্করণ
একুশে বইমেলা ২০১৭

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৩

প্রচ্ছদ
উত্তম সেন

প্রকাশক
কথামালা
বাড়ি ১৪, রোড ২৮, সেক্টর ৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ০১৬৭৮৬৬৪৪০১

মুদ্রণ
মেভিস প্রিন্টার্স
১৪৫, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

ঘরে বসেই কথামালা প্রকাশনীর বই পেতে
ভিজিট করুন- www.rokomari.com

মূল্য ঃ ১৫০/-

Bazu Kurung

Abul Hasan M. Sadeq
Second Edition: February 2017
First Edition: February 2013
Published by: Kothamala
House-14, Road-28, Sector-7, Uttara, Model Town, Dhaka-1230.
Phone- 01678664401
email : kothamalaprokashani@gmail.com
website: www.aub.edu.bd/home/kothamala
www. aub.edu.bd/home/kothamala-publications

Price: Tk. 150.00

ISBN : 978-984-92518-4-2

উ|ৎ|স|র্গ

সালেহা সাদেক
আমার সৃজনশীল কর্মের প্রেরণা
আমার জীবনসঙ্গিনী।

সমাজের কলুষিত নগ্নদেহ শোভিত হোক শালীনতায়।

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

সূ|চি|প|ত্র

বাজু কুরুং ৭
টিকেট ১৩
খাল কাটা ১৮
উপপত্নী ২১
টোকাই ২৮
সেই জন্মদিনের ড্রেসে ৩২
হিরণ ৩৯
নাবলু ৪৩
গুম ৫১
বরযাত্রা ৫৫
৫৯ ফষ্টি-নষ্টি
৬৫ বউ
৭১ পীরপুর দরগাহ
৭৬ সন্দেশ
৮০ সুফিয়া
৮৬ নারী
৯২ লাল বউ
৯৭ মাহমুদ রাশদান
১০৪ প্যাট্রিসিয়া
১০৮ বাইট্যা কুত্তা

বাজু কুরুং

বিমানের দরজায় মুচকি হেসে বিমানবালা বিদায় দিলো, বাই।

নেমে গেলাম বিমান থেকে। জাকার্তা বিমানবন্দর। ইমিগ্রেশন পার হতেই দেখা গেলো আমার নামের প্যাকার্ড উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে। উঠতি বয়সের মেয়ে। তার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসতেই সে বুঝে নিলো, আমিই সে মেহমান যার জন্য সে অপেক্ষা করছে। নিকটে যেতেই সে বললো,

Are you Dr. Zaman?

মাথা নেড়ে সাড়া দিলাম। সেও মুচকি হেসে স্বাগত জানালো। আর আমার টেনে-নেওয়া ব্যাগটা হাতে নিয়ে এগিয়ে চললো অভ্যর্থনা ডেস্কের দিকে। চলার পথেই অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে নানা কথা বলে গেলো। ফ্লাইটে কোনো অসুবিধে হয়নি তো? এ কি তোমার প্রথম জাকার্তায় আগমন, নাকি আগেও এসেছো? তুমি আসতে পেরেছ সেজন্য আমরা প্রীত বোধ করছি ইত্যাদি অনেক কথা। তার দেহে শৈল্পিক আঙ্গিকের সংক্ষিপ্ত পোশাক, যা তার দেহকে আরো শৈল্পিক আমেজে দুলিয়ে দিচ্ছে।

অভ্যর্থনা ডেস্কে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটি মেয়ে। সমবয়সীই হবে। গোটা দেহ জুড়ে সুন্দর পোশাক। হাতের কবজি অবধি হাতা। কবজির পাশে হাতার শেষ অংশটি ভাজ করা। কিছুটা ফুলের মতো। গলাটাও খোলা নয়। মাথায় স্কার্ফ। শুধু মুখটা খোলা আছে, যেনো ঝিনুকের ফাঁকে মুক্তার ঝলক, যাতে এখনো মুক্তা আরোহণকারীর হাত লাগেনি বলেই মনে হল। মেয়েটি লাজুক চোখের ইশারায় স্বাগত জানিয়ে মাথা নিচু করলো। মুহূর্তের লাজুক চাহনী ও অভিব্যক্তিতে যে কতো রাজ্যের কতো না বলা কথা লুকায়িত, তা পাঠ করতে কবি না হলেও

কোনো কবির অনুভূতি একান্তই প্রয়োজন।

রাত কাটলো হোটেলে। সকাল আটটা তিরিশ মিনিটে কনফারেন্স রেজিস্ট্রেশন। সময় মতো নাস্তা শেষ করে রেজিস্ট্রেশন ডেস্কের দিকে গেলাম। সেখানে তিনটি কাউন্টারে তিনটি মেয়ে বসে আছে। দু'টি মেয়ে বেশ খোলামেলা। আরেকজন হলো এয়ারপোর্টের সেই লাজুক মেয়েটি, যে নিজেকে সযতনে আবৃত করে রেখেছে। বাকি দু'জন মেয়ে ডিঙ্গিয়ে আমি তার নিকট গিয়ে দাঁড়ালাম। সে বললো, স্বাগত।

ধন্যবাদ।

তুমি তো কাল এলে তাই না?

হ্যাঁ। এয়ারপোর্টেই তোমার সাথে দেখা হলো।

আমার মনে আছে।

মনে আছে শুনেই জামান সাহেবের মনের ভেতর একটা কৌতুহলের বাতাস বয়ে গেল। কিঞ্চিৎ উৎসাহ নিয়ে বললো,

তোমরা তো অনেককেই অভ্যর্থনা জানালে। তা আমার ব্যাপারটা কীভাবে মনে থাকলো?

তুমি একটু আলাদা তাই।

আলাদা মানে?

কেমন আলাদা জানি না। তবে একটু আলাদা। তার এ মন্তব্যে মনে কিছুটা কৌতুহল ও চাপা উচ্ছ্বাস উঁকি দিলো। মেয়েটির দিকে ঝুকে বললাম,

তোমার পোশাকটা খুব সুন্দর। ভালো লাগে।

প্রত্যাশিত অভিব্যক্তির বদলে সে অত্যন্ত সাবলীলভাবে বললো,

অন্য মেয়েদের পোশাক তো আরো সুন্দর। ফ্যাশন ডিজাইনের পোশাক।

তা হলে তুমি তা পরো না কেন?

যার যে রুচি। আমি আমার পোশাককেই ভালবাসি।

কিন্তু কেন?

যা সংরক্ষণের, তা উন্মুক্ত করে দিলে তার মূল্য থাকে না।

তুমি ঠিক বলেছো। তাই তো তোমাকে এতো আকর্ষণীয় লাগছে।

যে চাপা উচ্ছ্বাস আমার ভেতরে কাজ করছিল, তার ভেতরে তা যেনো আর চাপা থাকল না। মিষ্টি হাসিতে লাজুক ভঙ্গিতে সে বললো,

সত্যি!

হ্যাঁ, সত্যি। আমার চোখে তোমার সাথে ওদের কোনো তুলনা হয় না।

আস্তে বলুন। ওরা শুনলে কিন্তু মাইন্ড করবে। আমার এ পোশাকের একটা নাম আছে। সুন্দর নাম।

কী নাম?

বাজু কুরুং। যদি এ ড্রেস তোমার ভালো লাগে তা হলে তোমার স্ত্রীর জন্য এক সেট নিয়ে যেতে পারো।

ভালো প্রস্তাব। তবে কোথায় পাবো, তা তো জানি না। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? দেখিয়ে দিতে পারো কোথায় পাওয়া যায়?

অবশ্যই সাহায্য করবো। কনফারেন্সের কার-পুল আছে। তুমি যখন চাও, তোমাকে শপিং-এ নিয়ে যাবো।

এখনো তো তোমার নামটা জানা হলো না।

আমার নাম ইয়াতী।

অনেক ধন্যবাদ।

রেজিস্ট্রেশন শেষ করে কনফারেন্স হলের দিকে গেলাম। ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কনফারেন্স উদ্বোধন করলেন। আজ আরো তিনটি বিজিনেস সেশন। রাত্রে রাষ্ট্রীয় ডিনার। ডিনারে বহু দেশের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বসেছেন। আমিও আছি। হঠাৎ দেখলাম, ইয়াতী কী যেনো খুঁজে বেড়াচ্ছে। দু'এক চক্কর ঘুরে সে এসে দাঁড়ালো আমাদের টেবিলের সামনে। সামনে অনেক মানুষ থাকলেও বিশেষ মনোযোগে আমাকে ইঙ্গিত করে বললো,

কেমন কাটলো সারাদিন?

এটা ছিল এক ভীষণ ব্যস্ত দিন। প্রোগ্রাম-সূচিটাও খুব টাইট।

এবার খেয়ে নাও। বাঁ দিকে ইন্দোনেশিয়ান মেনু, আর ডান দিকে পশ্চিমা মেনু। যেটা ইচ্ছা খাও। দু'দিক থেকেও নিতে পারো। তা হলে দু'টি স্বাদই পেয়ে যাবে।

ডিনার শেষে রুমে আসার পর সারাদিনের ক্লান্তি যেনো একেবারেই গ্রাস করে নিল। কিন্তু অন্য কোনো ভাবনার ফুসরত না পেলেও ইয়াতীর ব্যাপারটা না ভেবে পারলাম না।

সকালে নাস্তার জন্য তৈরি হয়েছি। এমন সময় কলিং বেল ক্রিং করে বেজে উঠলো। দরজা খুলতেই একটা মুচকি হাসি।

এই নাও, কুয়ে।

কুয়ে মানে কী?

কুয়ে হলো ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় বিশেষ পিঠা।

ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে রুমে ডাকলাম, একসাথে খাওয়ার জন্য। কিন্তু সে বললো, আমার অনেক কাজ। তুমি খাও। আশা করি ভালো লাগবে।

কুয়ে কতো দিন ভালো থাকে?

যেন কটাক্ষ করেছি, তাই খুব একটা সিরিয়াস ভঙ্গিতে ইয়াতি বলে উঠলো,

কেনো, কী ব্যাপার? তোমাকে তো ফ্রেস কুয়ে দিয়েছি। তা বাসি নয়। নষ্টও নয়।

সে কথা নয়। তা তো ফ্রেশই। তবে এক টুকরো কুয়ে আমি ব্যাগে ঢুকিয়েছি দেশে নেওয়ার জন্য। তা কতো দিন ভালো থাকবে?

তাই নাকি? কুয়ে তোমার এতো পছন্দ হয়েছে?

তা শুধু স্বাদের জন্য নয়, এটা যে তোমার হাতের।

ইয়াতীর লাজুক মুখ লাল হয়ে উঠলো। সে মাথা নিচু করে বললো, আমি যাই।

কনফারেন্স চললো তিন দিন। এর মধ্যে ইয়াতীর সাথে দেখা হলো অনেক বার। কখনো কারণে, কখনো বা অকারণে।

সে কখনো হোটেল রুমে ঢুকেনি। কোনো দীর্ঘ আলাপচারিতাও হয়নি। কিন্তু কেন জানি ভাবনাবোধের বিস্তৃত জগতে চললো তার নিবিড় বিচরণ।

আজ কনফারেন্সের শেষ দিন। কাল ফিরতি ফ্লাইট।

ব্যস্ত সময় গেছে কনফারেন্সে। শপিং-এ যাওয়ার কোনো সুযোগই হয়নি। আর আজ বিকেলটা ছিল গাইডেড ট্যুর। কনফারেন্স কর্তৃপক্ষ জাকার্তার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ঘুরিয়ে দেখাবেন। বিকেল তিনটায় ট্যুর গাড়ি ছাড়বে।

এখন কনফারেন্সের শেষ অধিবেশন চলছে। শেষ অধিবেশন একটু দেরিতেই শেষ হলো। একটার সময় শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু শেষ হলো প্রায় দুটোয়। এরপর লাঞ্চ। লাঞ্চ শেষ করে ট্যুর গাড়ির দিকে রওনা দিলাম। মনে মনে ইয়াতীকে খুঁজে বেড়ালাম। পেলাম না। হয়তো কোথাও সে ব্যস্ত আছে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা পার করে প্রফুল্ল হবার মতো জাকার্তার অনেক উপকরণ দেখেও প্রফুল্ল হতে না পেরে যখন ট্যুর থেকে ফিরলাম তখন রাত আটটা। ডিনারের সময়। ততক্ষণে ওয়ার্কিং আওয়ার শেষ। কাজেই ফিরে ইয়াতীর দেখা পাওয়া গেলো না। ডিনারের পর তাই হোটেলের ভেতরেই দোকানের দিকে একটু ঘুরতে গেলাম। ইয়াতীকে দেওয়ার জন্য একটা গিফ্‌ট কিনলাম। কাল সকালে তাকে দিয়ে দেবো।

সকালে নাস্তার আগেই অভ্যর্থনা ডেস্কে গেলাম ইয়াতীর সাক্ষাতের আশায়। কিন্তু সে ডেস্ক উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। পরে দ্রুত গেলাম কনফারেন্স প্রশাসনের কক্ষে। সেখানে শুধু দু'জন ব্যবস্থাপক বসে আছেন। জানতে পারলাম বাইরের যাদেরকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, গতকালই তাদের কাজ শেষ হয়েছে। আজ কেউ আসবে না। কথা শুনে মাথায় বজ্রপাত হলো।

সারাদিন বিমর্ষভাবে কাটলো। বিকেলে ফ্লাইট। যাওয়ার পূর্বে প্রশাসনের কয়েকজনের নিকট ইয়াতীর ফোন নাম্বার জানতে চেষ্টা করলাম। কেউ দিতে পারলো না। হোটেলের অভ্যর্থনা কাউন্টারে গিয়ে বললাম,

আমি এ গিফ্‌ট প্যাকেটটা ইয়াতীর জন্য রেখে যেতে চাই। কখনো সে এলে যেনো দেওয়া হয়।

তারা বললো, ইয়াতী কে? আমি কনফারেন্সের কথা বলতেই ভদ্রলোক বলে উঠল, কনফারেন্সের ব্যবস্থাপনার লোকজন বাইরের। তারা কোনোভাবেই হোটেলের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, স্যার।

মনটা খুবই খারাপ হলো। কিন্তু কিছুই করার নেই। বিকেলে কনফারেন্সের গাড়ি আমাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিলো। মন্থর গতিতে এগিয়ে গেলাম এয়ারপোর্টের ভেতরের দিকে।

আমি গেইটে ঢুকার জন্য পা দিয়েছি, এমন সময় দেখলাম, ইয়াতী দাঁড়িয়ে। হাতে বাজু কুরুং।

টিকেট

কু-ঝিক-ঝিক! কু-ঝিক-ঝিক!

কু-ঝিক-ঝিক চলছে রেল গাড়ি। রেল-লাইন লোহা দ্বারা নির্মিত, আর রেলের চাকাও লোহা দিয়ে তৈরি। গাড়ি চললে লোহার চাকা ও লোহার লাইনের ঘর্ষণে কু-কু আওয়াজ হয়। আর রেল-লাইনের জোড়া লাগানো পাতগুলো অতিক্রম করার সময় শব্দ হয় ঝিক-ঝিক। দু'য়ে মিলে কু-ঝিক-ঝিক, কু-ঝিক-ঝিক।

ট্রেনের ভেতরে ভালো লাইট নেই। আবছা আলো। বাইরে আঁধার রাতের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। অমাবস্যা রাতে অতলান্ত আঁধারের নিস্তব্ধতা। দূরের বাড়িগুলোতে হয়তো জালানো আছে হ্যারিকেন, কুপি। এদিক সেদিক দু'একটা জোনাকি হয়তো বা জ্বলছে, কিন্তু তার আলো শা শা করে চলা ট্রেনের গতিতে হারিয়ে গেছে। ট্রেন চলছে ধেয়ে।

গভীর রজনীতে ট্রেনে তেমন ভীড় নেই; তাই বলে একবারে ফাঁকা নয়। ট্রেনের তৃতীয় ক্লাসের এক বগিতে এক কোনায় বসে আছেন ইকবাল সাহেব। আর জানালা খুলে উপভোগ করছেন আঁধারের রূপ, ট্রেনের কু-ঝিক-ঝিক যন্ত্র-সঙ্গীত। ভাবছেন, তাঁর সাথে যদি তার স্ত্রী থাকতেন, আর থাকতো সন্তানেরা, তারাও এ মনোরম পরিবেশ ও দৃশ্য উপভোগ করতে পারতো। ভাবছেন, সকাল নাগাদ তিনি ঢাকায় পৌছে যাবেন। তারা হয়তো তাঁকে নেয়ার জন্য স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবে। ছেলে মেয়েরা এসে জড়িয়ে ধরবে। তার স্ত্রী হয়তো সবার সামনে জড়িয়ে ধরতে পারবেন না। তবু হয়তো মিষ্টি হেসে ও চোখের ভাষায় স্বাগত জানাবেন। এভাবে ট্রেনে বসেই তিনি ডানা মেলে দিয়েছেন কল্পনার জগতে।

এমন সময় তিনি লক্ষ্য করলেন, তাঁর পাশে বসে আছে এক যুবক ছেলে। বয়স ২০ বা ২২ হবে। তার চোখে মুখে সীমাহীন চিন্তার রেখা। মুখে ফুটে উঠেছে ভয়, ভীতি, উৎকণ্ঠা, দ্বিধা, সন্দেহ। সে শান্তভাবে বসে থাকতে পারছে না, উপভোগ করতে পারছে না আঁধারের রূপ। তাকে মনে হচ্ছে অত্যন্ত অস্থির, ব্যস্ত, গম্ভীর। ইকবাল সাহেব তার অজান্তেই তার কল্পনার জগত থেকে এ যুবক ছেলেটির মনোজগতে প্রবেশ করলেন।

কেন ছেলেটি এমন অস্থির, কেন সে উৎকণ্ঠিত! তিনি ভাবছেন, হয়তো কোথাও তার কোনো আপনজন বিপদে আছে। হয়তো কেউ অসুস্থ। হয়তো কোনো কিছু হারিয়ে গেছে। এরূপ নানা ধরনের কথা তার মনে জাগ্রত হলো। অবশেষে তিনি ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন তার নাম, ঠিকানা, কোথায় যাচ্ছে এবং কেন সে এতো চিন্তাগ্রস্ত।

ছেলেটির নাম জাহের। ইকবাল সাহেবের প্রশ্ন সত্ত্বেও সে উত্তর দিচ্ছিল না। ভয় পাচ্ছিল। সে জানে না, তিনি কে। কী জন্য কথা বলছেন, প্রশ্ন করেছেন। তার সাথে কথা বলে সে কি বিপদে পড়ে যায়। এ দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে সে মাথা নিচু করে রয়েছে। কিন্তু তার অবস্থা দেখে ইকবাল সাহেবের মনে মায়া হলো। তিনি চিন্তা করলেন, হয়তো ছেলেটি কোনো বিপদে আছে। হয়তো অত্যন্ত ভয়ে আছে। তাকে সাহায্য করা প্রয়োজন। এজন্য তিনি তাকে অভয় দিয়ে বললেন, তোমার কোনো ভয় নেই। কথা বলো। আমাকে বলো তোমার কী সমস্যা।

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে জাহের বললো,

আমি কি ঢাকায় কুলির কাম পামু, বাবু?

কী বললে? কুলির কাজ?

জ্বি, বাবু। কুলির কাম না পাইলে আমার সব শেষ অইয়া যাইব। স্যার, আমারে একটা কুলির কাজ নিয়া দিবেন? আপনার পায়ে ধরি। দিবেন স্যার?

কুলির কাজ! কী বলছো তুমি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। খুলে বলো।

বাবু, আমার মা রোগী। সরকার বাড়ির কাজ আর করবার পারে না। আমার এক বইন, এক ভাই। তারা ছোট। ঘরে খাওন নাই। আমি সবদিন কামলার কাম পাই না। এ জন্য আমি ঢাকা যাইতাছি।

ঢাকা গিয়ে কী করবে? তুমি কি লেখাপড়া জান?

না, স্যার। আমি মূর্খ, লেখাপড়া জানি না। আমি ঢাকা ইস্টিশনে কুলির কাম করার লাগি যাইতাছি। খাঁ বাড়ির করম আলী ঢাকা ইস্টিশনে কুলির কাম করে। ভালো টেহাই কামাই করে। আমিও কুলির কাম কইরা টেহা আনুম। মা'রে বাঁচাইতে চাই। ভাই বোনদের মুখে দুইডা খাওন দিবার চাই।

তোমার বাপ কোথায়? সে কোনো কাজ করে না?

বড় বাড়ির ওরা বাবারে মাইরা ফালাইছে। আমাগো বাড়ির সীমানায় যে কড়ই গাছটা আছিল, বড় বাড়ির তারা তা কাইট্যা নিতে চাইলো। বাবা মানা করায় তারা বাবার মাথায় লাঠি মারে। বাবা তখনি মারা যায়।

বড় দুঃখের কথা। তা তোমাদের জমিজমা নেই?

না সাব, বাড়ির ভিটা ছাড়া কোনো জমি নাই।

তা হলে তোমাদের সংসার চলতো কী করে?

বাবা কামলা দিতো। বাবা মারা যাওয়ার পরে মা সরকার বাড়ি কাম করতো। এখন তার অসুখ। আমি কাম পাই না। এর লাইগ্যা আমি ঢাকা যাইতাছি। আমারে একটা কুলির কাম জোগাড় কইরা দেন না, স্যার!

কথায় কথায় ট্রেন এক স্টেশনে এসে থামলো। সে স্টেশনে অনেক প্যাসেঞ্জার নেমে গেলো। আবার অনেক নতুন প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠলো। তাদের সাথে ইকবাল সাহেবদের কমপার্টম্যান্টে কালো জ্যাকেট পরা একজন উঠলো। তাকে দেখেই জাহেরের মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেলো। তার অস্থির চেহারা হলো অস্থিরতর। তার মুখ চোখ হয়ে গেলো ঘন কালো মেঘের ছায়ায় আছন্ন। বিমর্ষ ভয়ার্ত নয়নে বার বার আড় নজরে জাহের তার দিকে তাকাতে লাগলো। এক গরু কুরবানীর পর আরেক গরুর দিকে ছুরি হাতে এগিয়ে গেলে সে গরু যেমন নির্বাক অসহায় ও করুণ দৃষ্টিতে চোখের জল ফেলে, জাহেরকেও তেমনি দেখালো। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জাহের জিজ্ঞেস করলো,

উনি কি টিটি? উনি কি টিকেট দেখনের লাগি আইছেন?

কেন? তাতে অসুবিধা কী?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই জাহের ট্রেনে বসার লম্বা বেঞ্চের নিচের দিকে তাকালো। নিচে একটু ফাঁকা জায়গা আছে দেখে সে বললো,

বাবু, উনি কি টিকেট দেখতে এ দিকে আইবেন? আমি যদি নিচে পালাই, দয়া কইরা তারে কইবেন না। আল্লাহর দোহাই দেই, কইবেন না।

কেন? কী ব্যাপার? তোমার টিকেট নেই?

বাবু, মাফ করেন। আমার কাছে টিকেটের পয়সা নাই। ভাবছিলাম, এতো রাইতে টিকেট দেখতে আইব না। টিকেটের পয়সা না থাকায় রাতে আইলাম। আল্লাহ এখন আমার কী অইব?

চিন্তা করো না। আমি ব্যবস্থা করবো।

ততক্ষণে লোকটি টিকেট চেক করতে করতে জাহেরের নিকট এসে উপস্থিত। এসেই বললেন, টিকেট দাও। জাহের হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। তখন টিকেট চেকার জাহেরের বাঁ কান ধরে এক হেঁচকা টান দিয়ে বললেন,

চোর, বদমায়েশ, টিকেট না করে গাড়িতে উঠিস। রাখ, আমি তোকে জেলে পাঠাচ্ছি।

জাহের টিকেট চেকারের পায়ে পড়ে দু'হাতে দু'পা জড়িয়ে ধরে মাফ চায়। কিন্তু টিকেট চেকার এক লাথি দিয়ে তাকে সরিয়ে দেন। ইকবাল সাহেব তাকে বললেন,

আমি তার টিকেটের দাম দিচ্ছি। তাকে ছেড়ে দিন।

না, আপনার ভালো মানুষি করার দরকার নেই। চোরের শাস্তি না হলে চোর তার চুরি চালিয়েই যায়। আমি তাকে জেলে দেবো। তবেই সে আর চুরি করবে না।

এরপর টিকেট চেকার টিকেট চেক করতে করতে অন্য সারিতে গেলেন। এদিকে জাহেরের প্রাণ ভয়ে উৎকণ্ঠিত। সে বার বার ইকবাল সাহেবের পা ধরে বলছে,

বাবু, জেলে গেলে আমার মা মইরা যাইব। ছোট্ট ভাইটা মইরা যাইব। বোনটাও না খাইয়া মইরা যাইব। আমি কী করমু?

উল্কা বেগে ছুটে চলেছে ট্রেন। জাহেরের কান্নার খবর তার নেই। ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের আনন্দ-ফুর্তির পাত্তাও তার নেই। সে চলছে তো চলছেই। হঠাৎ

ইকবাল সাহেব ফিরে দেখেন জাহের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেন,

তুমি সেখানে কী করছো?

বইসা থাকতে থাকতে ভালা লাগতাছে না ... । বাবু, আমি জেলে যাইতে চাইনা । আমার মা মইরা যাইব । আমি জেলে যামু না...না, আমি জেলে যাইতে চাই না ।

এমন সময় হঠাৎ ঝপাৎ করে একটা আওয়াজ হলো । নিমিষে সবাই সেদিকে তাকালো । দেখলো, সবই আছে, শুধু নেই জাহের । দরজায় আছে একটু ফাঁক । বাইরে আছে সীমাহীন আঁধার আর কু-ঝিক-ঝিক ।

খাল কাটা

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন।

চৈত্রের দুপুরে আগুন ঝরা রোদ্দুর। সামনে ঢেউ খেলে যায় অগ্নিরশ্মির মরীচিকা। কামাল সাহেবের বাড়িতে শুকনো কাঠের ফ্রেমে টিনের চাল আর বাঁশের বেড়া। গরমে তেতিয়ে আছে চার ভিটার চারটা ঘর। দু'দিকে আছে শুকনো খড়ের পিরামিড। দিয়াসলাইয়ের খোঁচা থেকেই সেখানে লেগেছে আগুনের নাচন। সে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়েছে খড়ের ঢিপু থেকে পূর্ব ঘরে। এরপর এক ঘর থেকে অন্য ঘরে।

বাড়ির মহিলা ও শিশুরা বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে সাহায্যের জন্য। কিন্তু কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে না। কেউ আগুন নেভাতে আসছে না। আশেপাশের ওরা জানালা দিয়ে বা দরজা একটু ফাঁক করে তাকিয়ে দেখছে। এগিয়ে গেলে তাদেরও বিপদ হতে পারে।

এটাই কামাল সাহেবের উচিত শাস্তি। শিক্ষিত হয়ে গ্রামের উপকার করবেন, তা না করে তিনি খাল কাটার ব্যবস্থা করেছেন। সরকারের নিকট থেকে খাল কাটার বরাদ্দ করিয়েছেন। তার এতো হিংসা কেন? দিনে দিনে খালটি মাটিতে ভরে গেছে, মরে গেছে। মোড়ল বাড়ির লোকেরা সে খালের সরকারি জায়গায় চাষ-বাস করে। এতে তো দেশের উৎপাদনই বাড়ে। উঠুক না সে ফসল মোড়ল বাড়ির গোলায়, তাতে কী আসে যায়? এ দিয়ে তো দেশই উপকৃত হয়। গরিবরা কামলা খাটে। দু'বেলা ভাত জুটে। এ ভরা খাল যদি কাটা হয়, তা হলে সেখানে কী করে ধান হবে? কীভাবে গরিবরা কামলা খেটে দু'পয়সা উপার্জন করবে? মোড়লদের শত বুঝাবার পরও কামাল সাহেব এ কথা বুঝেনি। অথবা বুঝেও না

বুঝার ভান করেছে। আসলে তার পেট ভরা হিংসা। এ গাঁয়ে হিংসুকের স্থান নাই।

মোড়লদের এ যুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারো নেই। তা হলে তাদেরও বারোটা বাজবে। কামাল সাহেবের পক্ষ নিলেই আর নিস্তার নেই।

খাল কাটা কামাল সাহেবের বহুদিনের স্বপ্ন। তাঁর গ্রামটি নিম্নভূমি, একটা ছোট হাওর এলাকার মতো। এক ফসলি জমির এ গ্রাম। এতে শুধু আমন ধান হয়। একটু বেশি বৃষ্টি হলেই পানি আটকে থাকে। এতে করে আমন ধানের চারা মরে যায়। চাষীরা কোনো ফসলই পায় না। শীতকালীন ফসল করার কোনো উপায় নেই। কারণ সেচের ব্যবস্থা নেই। এ অবস্থায় যদি মরা খালটা কাটা হয়, তা হলে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হয়। কৃষকরা ফসল পাবে। গোটা এলাকাটাই রক্ষা পাবে।

এটাই কামাল সাহেবের বহুদিনের পরিকল্পনা। শিক্ষা বঞ্চিত এ গ্রামের দিকে তাকানো তাঁর দায়িত্ব। এ উপলব্ধি থেকে তিনি সরকারের নিকট খাল কাটার আবেদন করেন এবং চেষ্টা তদবির করতে থাকেন। কিন্তু বাধ সাধলো মোড়ল বাড়ি। কারণ এতে তাদের ক্ষতি হবে। দখল করা খালের জমির ফসল হারাবে। কাজেই তারা কামাল সাহেবকে শাসিয়ে দিয়েছে। খাল কাটার জন্য চেষ্টা করলে তার বিপদ হবে।

কামাল সাহেব এতে দমে যাননি। তিনি চেষ্টা চালিয়ে যান গোপনে গোপনে। রাতের অন্ধকারে তিনি ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে বুঝান। কারণ খালের প্রজেক্ট অনুমোদনের জন্য সরকারি তদন্ত আসবে। তখন গ্রামের তরফ থেকে খালের পক্ষে কথা বলতে হবে।

অবশেষে খাল কাটার প্রজেক্ট অনুমোদন লাভ করলো। এতে কামাল সাহেব আনন্দিত ও পুলকিত। তিনি ছুটে যেতে চাইলেন গ্রামে। গাঁয়ের মানুষকে এ সুখবরটা দিতে। কিন্তু মোড়ল বাড়ি! তিনি থমকে দাড়ালেন। ভাবলেন, দিনে যাবেন না। রাতে যাবেন।

রাতের গভীরে কামাল সাহেব ঝন্টু মিয়ার দরজায় টোকা দিলেন। ঝন্টু মিয়া কামাল সাহেবকে দরজায় দেখে জড়িয়ে ধরলো। কামাল সাহেব বললেন,

ঝন্টু মিয়া, খুশির খবর ...

কামাল সাহেব কথা শেষ করতে পারলেন না। ঝন্টু মিয়া তার কথা কেড়ে নিয়ে বললো,

স্যার, আল্লাহ আপনার বহুত ভালা করুক। কিন্তু ওরা কেমনে জানি খবরটা পাইয়া গেছে।

তাই নাকি?

জ্বি স্যার। এরপর ওনারা আপনাগো বাড়ি গেলো। আর ধমকাইয়া দিলো,

আপনারে দেখাইয়া দিবো।

আচ্ছা!

জ্বি স্যার, আমি কইতাছি কী ... আপনে রাইতেই চইল্যা যান।

তা যাবো। কিন্তু মানুষকে এ সুখবরটা দেবো না?

স্যার, সবাই খবরটা পাইয়া ফালাইছে। হক্কলে খুশি। আপনার লাইগ্যা দোয়া করছে। কিন্তুক দোহাই লাগে, আপনি চইল্যা যান।

কামাল সাহেব রাতেই বাড়ি ছাড়েন। কিছুদিনের মধ্যে গ্রামে খাল কাটার ঠিকাদার এলো। এতে মোড়ল বাড়ির ওরা ভীষণ ক্ষেপে আছে। তারা ঠিকাদারকে ভীষণভাবে গালিগালাজ করে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করলো। এ কথা শুনে কামাল সাহেব গোপনে থানায় গিয়ে সাহায্য চাইলেন। এতে কাজ হলো। থানা-পুলিশের সহযোগিতায় সে গ্রামে পুলিশের ছোট্ট একটা ক্যাম্প খোলা হলো।

শেষ হলো খাল কাটা। আর চলে গেলো ঠিকাদার। সাথে সাথে গ্রাম থেকে উঠে গেলো পুলিশের ক্যাম্প। এ সুযোগে ওদিকে গর্জে উঠলো মোড়ল বাড়ি। তারা আগুন দিলো কামাল সাহেবের বাড়িতে। চৈত্রের দুপুরে সে আগুন ছারখার করে দিলো সবকিছু।

তা শুনেও বাড়ি ফিরে আসতে পারলেন না কামাল সাহেব। তিনি শুধু বললেন, একটা বাড়ি দিয়েও যদি একটা গ্রাম বাঁচানো যায়, তাতে দুঃখ কী?

উপপত্নী

জাহের সাহেবের ফাটা কপাল। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান হিসেবে সীমাহীন আদর পেয়েছেন। মায়ের একান্ত স্নেহে লালন, বাবার অনন্য যতনে পালন। লেখাপড়ায়ও ভালো। এমএ পাশ করেছেন। ভালো চাকুরিও হয়েছে। আর এই ফাটা কপালের প্রশস্ততা যেনো আরো বেড়ে গেছে এক অনিন্দ্য সুন্দরী বউয়ের পরশে। যার দিকে তাকালে পুরুষের দেহে উষ্ণতার জ্বর আসে। যে রমণী যুবকের বুক চিরে ভেতরের হৃদয়টাকে ঈগল পাখির ঝটকা ছোবলে কেড়ে নিতে পারে। নাম তার বিউটি। আর জাহের সাহেবও হ্যান্ডসাম। লম্বা, স্লিম। মিষ্টি চেহারা। ফর্সা রং। তা হলে, দাঁড়ায়,

সুন্দর + সুন্দরী = অনন্য সৌন্দর্য।

যাতে সৌন্দর্য আছে, তা হয় সুন্দর। আর যার আপাদমস্তকই সৌন্দর্যে ভরা, তা শুধু সুন্দর নয় বরং তা হলো স্বয়ং সৌন্দর্য। বাংলা ব্যাকরণে এ নীতি শাস্ত্রের প্রয়োগ না হলেও পুরোপুরি প্রতিফলিত হলো এ যুগলের ঘরে। তাদের ঘরে জন্ম নিলো এক কন্যা-সন্তান, যার তুলনা সে নিজেই। যেনো প্ল্যাটিনামের আংটিতে ডায়মন্ডের ঝলকানো তারকা। মায়ের কোলে পূর্ণিমার চাঁদ। নাম রাখা হয়েছে কিউটি। এ তিনজনের স্বর্গীয় সুখের সংসার।

কিউটির এখন ষোল। তার চলনে যৌবন দোলে। পৌরুষের কামনায় ঝড় তোলে। এখানেই যতো ভয়। বিউটি তাই কিউটিকে সর্বদা আগলে রাখে। স্কুলে নিয়ে যায়। ছুটির সময় নিয়ে আসে। তিন জনের এ ছোট সংসারে স্বামীকে নিয়েও বিউটি থাকে ব্যতিব্যস্ত। তাই সে অফিস থেকে ফেরার সময় হলে স্বামীর পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুটা দেরি হলে বুক ধড়পড়িয়ে ওঠে। ঘরে

ফিরলে ত্রিমুখী নদীর মিলন স্থলে সৃষ্টি হয় উচ্ছল আনন্দের ঢেউ।

কিন্তু এ সুখ বেশিদিন সইল না। সেদিন স্বামীর ফেরার সময় পার হয়ে গেছে। চাতকের দৃষ্টিতে পথের দিকে তাকিয়ে বিউটি ও কিউটি। জাহের সাহেবের দেখা নেই। বিউটি দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকায়, কিউটি তাকায় হাতঘড়ির দিকে। দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। এখনো দেখা নেই তাঁর। মোবাইলটা ভুলে রেখে গেছেন বাসায়। আঁধার নেমে এসেছে। ওদের গলির রাস্তায় আবার তেমন আলো নেই। যে লাইটটি ছিল, তাও নষ্ট হয়ে গেছে মনে হয়। কাজেই বাসার সামনে অন্ধকার। এ অবস্থায় এমন দু'টো নারীর পক্ষে দরজা খুলে বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। কাজেই দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে এদিক সেদিক ফোন করতে লাগলো তারা।

এমন সময় দরজার কলিং বেল বিকট চিৎকার করে উঠলো। ভয় ও ত্রাসের এ নিরবতায় একটা বুলেটের মতো তা বিউটি ও কিউটির হৃদয়টাকে ছেদ করে গেলো। কিউটি দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললো। পেছনে পেছনে দৌড়ালো বিউটি। সামনে দাঁড়ালো কয়েকজন পুলিশ। পাশে আছে লাশের গাড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে উপস্থিত হলো জাহের সাহেবের বস, মেহের সাহেব। দুর্ঘটনায় এ মৃত্যুর কথা শোনা মাত্রই তিনি দেখতে চলে এসেছেন।

বিউটি ও কিউটির হৃদয় বিদ্যুৎপিষ্ট হয়ে যেনো আছাড় খেয়ে পড়লো। মেহের সাহেব তাদেরকে দাঁড় করার চেষ্টা করলেন। কিউটিকে টেনে তুলে জড়িয়ে ধরলেন। বিউটি এতে দুঃখের সাগরে ভেসে থাকা খড়কুটার আমেজ খুঁজে পেলো। একটা ষোড়শী যুবতীকে এভাবে জড়িয়ে ধরা তখনি সম্ভব, যখন মেয়েটির প্রতি পরম পিতৃস্নেহের আবেগে আপ্লুত হওয়া যায়। কিউটির প্রতি মেহের সাহেবের এমন স্নেহের পরশ অনুভব করে বিউটি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়ে। মেহের সাহেব তাকে আশ্বস্ত করে বললো,

যা হওয়ার ছিল তা-ই হয়েছে। কিউটি এখন আমার মেয়ে। আমি আপনাদের পাশে থাকবো।

যতো কিছুই ঘটুক, দুনিয়া কখনো থেমে থাকে না। কিছুদিন পর কিউটি আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করলো। তবে এবার তাকে পিতৃহীন ভেবে ইভটিজিং বেড়ে গেলো। মেহের সাহেব ভাবলেন, এমন মেয়েকে অন্যের নজর থেকে বাঁচিয়ে রাখাই ভাল। কোমল গোলাপের উপর অনবরত অহেতুক দৃষ্টিপাত এক সময় তার সৌন্দর্যকে ফিকে করে দেয়। তাই মেহের সাহেব বিউটিকে বললো,

কিউটির কি চাকুরি করতে হবে? এ মেয়েকে যে কোনো রাজপুত্র নিয়ে রানীর মতো রাখবে। কাজেই এসব বেয়াড়া বখাটেদের উপদ্রবের মুখে তাকে স্কুলে পাঠাবার প্রয়োজন নেই। তার ভবিষ্যতের দায়িত্ব আমার। আমি নিজে তাকে বাসায় পড়াবো।

তাদের বাসায় মেহের সাহেবের ঘন ঘন আসা-যাওয়া শুরু হলো। বিশেষ করে তিনি কিউটির নিঃসঙ্গতা দূর করার চেষ্টা করেন। এটা সেটা আলোচনা করতে করতে চলে আসে রোমান্টিক আলোচনা, এ যুগে বিদেশে রোমান্টিক জীবন কেমন ইত্যাদি। কিউটি এসব উপভোগই করে। কিউটির একাকিত্ব কাটাবার জন্য মেহের সাহেব মাঝে মাঝে তাকে বাইরে নিয়ে যান। কখনো নিয়ে যান চিড়িয়াখানায়। আবার কখনো কোনো পাঁচতারা হোটেলে নিয়ে খাওয়ান। পাশাপাশি চলতে ও বসতে গিয়ে কখনো কোনো অসতর্ক মুহূর্তে কিউটির দেহে মেহের সাহেবের হাতের পরশ যে লেগে যায় না, তা নয়।

একদিন মেহের সাহেব কিউটিকে সিনেমায় নিয়ে গেলেন। তিনি সবার পেছনের সারির সবগুলো টিকেট কিনে নিলেন। সুতরাং পেছনের সারিতে শুধু তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। সিনেমা চলছে। দু'জনে নিচু কণ্ঠে কথাও হচ্ছে। সামনের দর্শনার্থীদের যেনো কোনো অসুবিধে না হয়, সেজন্য তারা একে অপরের দিকে বেশ ঝুঁকে কথা বলছে। মাঝে মাঝে বেশি ঝুকে পড়ার ফলে দু'জনের কান বা গাল যে দুজনকে স্পর্শ করে যাচ্ছে না, তাও নয়। এভাবে কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চিত মেহের সাহেব কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে বললেন, তোমার আব্বা তো তোমাকে অনেক আদর করতেন, তাই না?

পিতৃবিয়োগের কোনো ভাবাবেগই কিউটির ভেতরে দেখা গেল না। কিন্তু তবু সে পর্দার দিকে তাকিয়ে বললো,

কোনো বাবা বোধ হয় তার মেয়েকে এমন আদর করেন না। তেমন আদর।

এবার কিন্তু মেহের সাহেব খানিকটা স্বস্তি নিয়ে সাহসের সাথেই বললেন, তিনি কি তোমাকে চুমু খেতেন না? প্রশ্নকর্তা মেহের সাহেবের মনে যতটা সংশয় ছিল, তার চেয়েও অধিক প্রত্যয়ে কিউটি বলে উঠল,

সব সময় খেতেন। আমার গালে যে কতো চুমু আছে, তার হিসাব নেই।

মেহের সাহেব আর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করে কিউটির মুখ টেনে এনে তার গালে এক লম্বা চুমু খেলেন। আর লাজুক অভিব্যক্তিতে কিউটি বললো: ধন্যবাদ।

এ ধন্যবাদকে মেহের সাহেব ইতিবাচক ঈঙ্গিত হিসেবেই ধরে নিলেন। তিনি অসতর্কতার ছলে কয়েকবার কিউটির গায়েও স্পর্শ করলেন। কিউটি সিনেমা দেখছে, যেনো তেমন কিছু টেরই পায়নি। সতর্ক ও ইচ্ছামূলকভাবেই এবার কিউটির গায়ে দু'একবার হাত বুলালেন মেহের সাহেব। কিউটি মৃদুভাবে বললো: থাক, কেউ দেখে ফেলবে।

মেহের সাহেব আরো অগ্রসর হলেন। একবার তিনি তাকে টেনে কোলে বসিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। কিউটি হ্যাঁ বাচক সম্মতিতে না'বাচক ভঙ্গিতে কাঁপা স্বরে বললো:

আপনি বেশ দুষ্টু তো! এতো লোকের সামনে ...। কেউ দেখে ফেললে আপনার ইজ্জত যাবে। ছাড়েন।

স্থায়ী একটা সমঝোতার পথ মনে মনে স্থির করে মেহের সাহেব বললেন,

তোমার সাথে আমার বিশেষ কিছু কথা আছে।

কিউটি চট করে উত্তর দিল,

বলুন।

না, এখানে বলা যাবে না। একদিন সারাদিনের জন্য কোথাও গিয়ে বলবো।

সিনেমা শেষে তারা দু'জনে কিছু পরামর্শ করলো। অতঃপর বাসায় ফিরে গিয়ে মেহের সাহেব বিউটিকে বললেন,

কিউটিকে একদিন আমি আমাদের বাসায় নিয়ে যেতে চাই। একরাত সেখানেই থাকবে। বুঝেনই তো, বায়ু পরিবর্তনও দরকার।

তা, এ ঝামেলার কী দরকার? আপনি যা করছেন, তার জন্য আমি আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

না, তেমন আর কী করছি! আর এছাড়া এটা তো আমার দায়িত্বও বটে।

দিন দশেক পরে মেহের সাহেব কিউটিকে নিয়ে রওনা দিলেন, তার বাসায়

একরাত রাখার জন্য। কিন্তু তাদের গাড়ি গিয়ে থামলো এক পাঁচতারা হোটেলের সামনে। ইতোপূর্বে কিউটি তার সাথে পাঁচতারা হোটেলে খেয়েছে। কিন্তু কখনও হোটেল রুমে ঢুকেনি। আজ হোটেল রুমে ঢুকেই কিউটি বললো,

ওয়াও! এতো সুন্দর রুম !

হ্যাঁ, বেশ মজা হবে।

কিন্তু কেউ দেখে ফেলবে না তো?

না, এখানে কেউ ঢুকতে পারবে না। ঢুকার অনুমতিও নেই।

তা হলেই হয়। একটু ভয় লাগে, এই যা। আচ্ছা বলুন, কী কথা বলবেন।

তা একটু নিঃশ্বাস ফেলে বসো না! বলবো তো!

কিন্তু আমরা এখানে কতক্ষণ থাকবো? কখন ফিরে যাবো?

তার মানে? এখানে রাত কাটাবো, তাই তো কথা! মাইন্ড চেইঞ্জ করেছো নাকি?

না, তেমন কিছু না। তবে কথা যেনো ঠিক থাকে।

তা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক থাকবে। আমরা গল্পগুজব করে রাত কাটাবো। তোমার মতের বাইরে কিছুই হবে না।

তা হলে ঠিক আছে। এবার বলুন, কী কথা আছে।

পাশাপাশি শুয়ে কথাবার্তা ও গল্প-গুজব শুরু হলো। মেহের সাহেব কিউটিকে গোপন বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। গোপনে দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা, নানা অজুহাতে বিদেশ ভ্রমণ, আনন্দ-ফূর্তি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক পরামর্শ হলো। কিউটি মেহের সাহেবের সাথে মোটামুটি একমত হলো যে, তাঁকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করাই হয়তো ভালো হবে, হোন তিনি কিউটির চেয়ে তিনগুণ বয়সের, আর হোক না এ বিয়ে গোপন সম্পর্কের।

এতক্ষণে মেহের সাহেব অতি আপন এক রোমান্টিক পুরুষ হিসেবে কিউটির মনে দোলা দিলো। রাত প্রায় শেষ। সারারাতে দেহ থেকে দেহান্তরে উষ্ণতা যে সঞ্চারিত হয়নি, তা নয়। এবার সে উষ্ণতার সাথে যোগ হয়েছে জীবন-যৌবনের সঙ্গী হওয়ার অনুভূতি। সে অনুভূতির শিহরণে উন্মুক্ত পাপড়ির কামনার মধু যেনো উপচে পড়ছে। কোনো ভ্রমর অনায়াসেই শুড় ঢুকিয়ে তৃপ্তিতে সে মধু

আহরণ করতে পারে। এতে আর কোনো বাধা আছে বলে মনে হয় না।

গোপন বিয়ের প্রস্তাবে কিউটির মা প্রথম দিকে দ্বিধা করলেও পরে রাজি হয়ে গেলো। এতে মা-মেয়ের সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর কিউটি তো কাটাবে রানীর জীবন। মেহের সাহেব ধনাঢ্য ব্যক্তি। ছোট বউ হিসেবে কিউটির আকর্ষণই হবে বেশি। কিন্তু বাধা দিলো কিউটির ঘনিষ্ট বান্ধবী শাহেরা। সে বললো:

এতো সুন্দরী মেয়ে হয়েও কি তুই উপপত্নীর জীবন বেছে নিবি?

কিউটি বললো,

পত্নী বা উপপত্নী, তাতে কী আসে যায়? অঢেল সম্পদ, রোমাঞ্চ, আর কী চাস? ভোগ করো জীবন।

কিউটি রানীর জীবনই বেছে নিলো। আগের বাসায় থাকলেও শান-শওকত আলাদা। এখন কার্পেট আছে। আছে ঝলমলে ফার্নিচার। নয়া নয়া গয়না। ক'দিন পর পর গোপন স্বামীর সাথে বিদেশ যাওয়া। এছাড়া স্বামী বেশি বয়সী হলেও তিনি কিউটির মতো সুন্দরীকে পেয়ে নব যৌবন ফিরে পেয়েছেন। এ জীবন বেছে নিয়ে কিউটি যে কতো ভালো কাজ করেছে, তা ভেবে কিউটির আনন্দের সীমা নেই।

অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেলো। এরপর হঠাৎ একদিন এক সুপার মার্কেটে স্কুল বান্ধবী শাহেরার সাথে কিউটির দেখা। তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরলো। শাহেরার সাথে তার স্বামী, এক মেয়ে ও দুই ছেলে। গোটা পরিবার ঈদের শপিং করতে এসেছে। বহুদিন পর দেখা হওয়ায় তারা সুপার মার্কেটের ভিতরে এক রেস্টুরেন্টে চা খেতে বসলো। শাহেরা তার পরিবারের পরিচয় দিলো। স্বামী সরকারি চাকরি করেন। বড় অফিসার। মেয়ে কলেজে ভর্তি হবে। দুই ছেলেই হাই স্কুলে আছে। শাহেরা তার স্বামীর নিকট কিউটিকে পরিচয় করিয়ে দিলো:

কিউটি যে কী কিউট ছিল, তা যদি দেখতে! সে স্কুল করিডোরে হেঁটে গেলে ঝড় বয়ে যেতো। কিন্তু কিউটি, তোর এ কী দশা! চেহারা ভেঙ্গে গেছে, যেনো ক্লান্ত বিধ্বস্ত! কী ব্যাপার?

না, তেমন কিছু না, অনেক দিন জ্বরে ভুগলাম তো, এই যা।

শাহেরার স্বামী জিজ্ঞেস করলেন,

তা ভাই কোথায়? উনি কি শপিং-এ আসেন না?

হ্যাঁ আসেন। তবে আজ একটু ব্যস্ত কি না, তাই।

তবে ছেলেমেয়েদের নিয়ে এলেন না কেন?

কিউটির চেহারার অবস্থা দেখে শাহেরাই এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিলো:

ওর বর বড়লোক। ছেলেমেয়েদের শপিং বিদেশ থেকেই করেন।

চা চলছে। কিউটি ও শাহেরা পাশাপাশি চেয়ারে বসা। ওরা দু'জনে মাঝে মাঝে কানাকানি কথাও বলছে। শাহেরা বললো- এখনো আদর পাস্ তো? আদরের কথা শুনতেই জেগে উঠা সুপ্ত হাহাকার কোনো এক ঘৃণার ছোবলে নিমিষেই নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

শাহেরার সাথে দেখা হওয়ার পর থেকেই কিউটির মন ভালো যাচ্ছিল না। সে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। একবার রাত দু'টায় সে শাহেরাকে ফোন করে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো,

আমার বড্ড একা ও নিঃসঙ্গ লাগে রে শাহেরা!

টোকাই

রাত দুপুরে এমন বিপদ! তারা বুঝতে পারছে না কী করা যায়। যেনো সবাই দিশেহারা। কেউ খাটের নিচে বালতি রেখে মাথায় পানি দেওয়ার জন্য পানি ভর্তি বদনা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ এক টুকরো কাপড় পানিতে ভিজিয়ে তা কপালে ধরে বসে আছে। কেউ বা অবিরাম ঝাড়ফুক দিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ টেনে দিচ্ছে হাতের আঙ্গুল।

রাত বারোটা বিয়াল্লিশ। হাসুর জ্বর ভীষণ বেড়ে গেছে। একশ চার ডিগ্রি। চোখ লাল। চোখে চুলকানিও আছে। এর মধ্যে সে চারবার মলত্যাগ করেছে। সাথে জমাটবাধা রক্তের কণা। নাভির নিচে চিন্ চিন্ ব্যথা। পায়ের রগ থেকে থেকে টানছে। এতে পা যেনো বাঁকা হয়ে আসে। জবান পুরাপুরি বন্ধ।

হায়রে কপাল, হাসুর মা ফাতেমা বিবি কেঁদে কেঁদে বলছে, ওগো আল্লাহ, তোমারই দান একটি মাত্র পোলা আমার। তাকে তুমি নিয়ে যেওনা। আমি দশটা রোজা রাখবো। পাঁচশ টাকা দান করবো। একশ' রাকাত নামায পড়বো। তুমি আমার পোলাটারে ভালো করে দাও।

এক সপ্তাহ যাবত হাসুর অসুখ। মাঝে মাঝে জ্বর একটু কমে। কিন্তু একেবারে সারে না। হাসুর বাপ করম আলী ভালো কবিরাজ ধরেছে। বেশ তার নাম, প্রচুর হাতযশ। তার কয়েক চামচ কবিরাজী ঔষধ খেলেই কঠিন কঠিন রোগ ভালো হয়ে যায়। তার দেওয়া এক বোতল সাল্‌সা বা এক কৌটা হালুয়া খেলে তেজী ঘোড়ার মতো তাকত্ হয়। এ কবিরাজের প্রতি করম আলীর অগাধ আস্থা। কিন্তু তার ছেলের বেলায় এ যাত্রা যে কী হলো, আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আসলে তকদীর কে বদলাতে পারে?

আর হায়াত-মউত তো আল্লাহ্‌র হাতে। ভালো ডাক্তার আর ভালো ঔষধই যদি সব রোগ সারাতে পারতো, তা হলে কারুন-হামান কেন মারা গেলো? ফেরাউনই বা মরলো কেন?

সবাই যখন হাসুকে নিয়ে ব্যস্ত, তখন হাসুর বাপ এসব ভাবতে ভাবতে যেনো খানিক অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তাকে এভাবে নিরব নিথর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাসুর মা কান্নাজড়িত কণ্ঠে অভিমানের সুরে বললো, ছেলেটার মরার দশা! আর তুমি কি না ধ্যান করছো?

মরণাপন্ন হাসুর খবর শুনে আশেপাশের আত্মীয়-স্বজন এসে জড়ো হতে লাগলো। রাত দু'টার দিকে হাসুর চাচা ধরম আলী এসে উপস্থিত। সে হাসুর বাপের ছোট হলেও দাপট অনেক। সে বড় ভাই করম আলীকে কথা বলতে হিসাব করে না। এমন কি ধমক দিতেও দ্বিধা করে না। সে সব শুনে হাসুর বাপের উপর ভৎর্সনার বাণ ছুড়ে মারলো!

এ বিজ্ঞানের যুগে তুমি কবিরাজ নিয়ে বসে আছো! ছেলেটাকে মেরে ফেলতে চাও? ছেলে যদি তোমার দরকার না হয়, আমাকে দিয়ে দাও।

কথাগুলো হাসুর বাপের মোটেই পছন্দ হলো না। কবিরাজী ডাক্তারির প্রতি কারো অবজ্ঞার মনোভাব দেখলে তার সহ্য হয় না। সে বললো, তুই এলোপ্যাথিক বিষ দিয়ে আমার পোলাটারে শেষ করতে চাস, তাই না? আমি তোকে তা করতে দেবো না। তবে হাসুর মা'ও যদি এলোপ্যাথিক খাইয়ে ছেলেকে মারতে চায়, আমি কিছু বলবো না। এটাই আমার শেষ কথা।

কিন্তু এ রাত নিশিথে ডাক্তার পাওয়া যাবে কোথায়? কাজেই বোতলে যে কবিরাজী ঔষধ অবশিষ্ট আছে তাই দেওয়া হচ্ছে। ধরম আলীও এতে বাধা দিলো না। এ রাতে তো অন্য কোনো ডাক্তার পাওয়াই যাবে না। কাজেই যা আছে, তা-ই চলুক। এতে হাসুর বাপের মনে আরো শক্তি সঞ্চয় হলো। সে উৎসাহের সাথে বললো, কবিরাজী ঔষধের সাইড-ইফেক্ট নেই।

দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেলো। মুমূর্ষু রোগী ঘরে রেখে কারো চোখে ঘুম নেই। সবাই বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে, কখন ডাক্তারখানা খোলার সময় হবে। ধরম আলী জোর দিয়েই বললো, কবিরাজীর পালা শেষ। হাসুকে এলোপ্যাথিক ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হবে। হাসুর মা এতে সায় দিলো। হাসুর বাপ এতে ভীষণ নারাজ। কিন্তু বাড়ির জনমত দেখে আর উচ্চবাচ্য করলো না। বরং মুখ কালো করে, গুমড়া মুখে, অন্য রুমে গিয়ে বসে রইল।

ধরম আলী ভাবলো, ডাক্তার অবশ্যই হাসুর পেশাব-পায়খানা পরীক্ষা করার কথা বলবে। কাজেই সে পরামর্শ দিলো, কালক্ষেপণ না করে সকালে হাসু প্রথম যে মলত্যাগ করবে, তা একটা কৌটায় নিয়ে নিতে হবে। পেশাবের স্যাম্পলও নেওয়া ভালো। তাই করা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা রওনা দেবে ডাক্তারখানায়। এমন সময় করম আলীর বড় ভাই জমীর আলী এসে উপস্থিত। তিনি দূরে থাকেন, তাই তো আসতে এতো দেরি। তিনি এসে হাসুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। মুখে বিড় বিড় করে কিছু পড়ে কপালে ফুঁক দিলেন। এরপর বললেন, কবিরাজি-টবিরাজি দিয়ে কাজ হবে না। হাসুর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রয়োজন।

ধরম আলী তার বড় ভাই করম আলীর উপর দিয়ে কথা বলতে পারে, কিন্তু সবার বড় ভাই জমীর আলীর সামনে জোর দিয়ে কথা বলার সাহস তার নেই। তবু সে বিনয়ের সাথে বললো,

বড় ভাই, এখন হাসুর ইমারজ্যান্সি অবস্থা। এখন 'ট্রায়াল এন্ড এরোর'-এর সময় নেই। পরীক্ষা করে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা দিলেই ভালো হবে মনে হয়।

তুমি যা জানো না, তা বলো না। এলোপ্যাথিক ঔষধ কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি। এতে প্রচুর সাইড-ইফেক্ট থাকে। এছাড়া এলোপ্যাথিক ঔষধ দেহের গভীরে গিয়ে রোগ নিরাময় করতে পারে না। বরং উপরে উপরে রোগ ধামাচাপা দেয়। এতে বাহ্যত তাড়াতাড়ি রোগ ভালো হয় বটে, কিন্তু ভেতর থেকে নিরাময় না হওয়ায় পুনর্বার রোগ দেখা দেয়। হোমিওপ্যাথিকে সময় একটু বেশি লাগলেও গোড়া থেকে রোগকে উপড়ে ফেলে। তা হলে কোনটা ভালো?

তা ঠিক, বড় ভাই। কিন্তু হাসুর অবস্থা কাহিল। এ অবস্থায় মনে হয় চাঞ্চ নেওয়া ঠিক হবে না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজ্ঞানসম্মত এলোপ্যাথিকে যাওয়াই ভালো হবে ।

কী বললে? বিজ্ঞানসম্মত এলোপ্যাথিক? তুমি কি বেশি বুঝ? না জেনে না শুনে বেশি পণ্ডিতগিরি দেখাবে না। তুমি কি সেই পুরনো প্রবাদ বাক্যটি এখানে শোননি,

যার নেই কোনো গতি
তার গতি হোমিওপ্যাথি ।

ভাই, একথা আমিও শুনেছি। যার সামর্থ নেই, তার জন্য কম খরচের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা। কিন্তু আমাদের তো হাসুর চিকিৎসা-ব্যয় বহন করার ক্ষমতা আছে। আমাদের কোনো গতি নেই, তা তো নয়।

একথা শুনে রাগে জমির আলীর চেহারা বেলুনের মতো ফুলে উঠলো। তিনি তেড়ে উঠে বললেন,

মূর্খ কোথাকার! এতো সোজা কথার অর্থটা পর্যন্ত বুঝতে পারিসনে! 'যার নেই কোনো গতি' মানে বুঝিস? দুনিয়াতে যার আর কোনো চিকিৎসা নেই, এলোপ্যাথিক-টেলোপ্যাথিক সবাই ফেল করেছে, তাদের শেষ আশ্রয়স্থল হলো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা।

ধরম আলী বুঝতে পারলো, তর্ক করে লাভ হবে না। সে ভাবলো, বড় ভাই যা-ই বলুক, সে হাসুকে এলোপ্যাথিকেই নিয়ে যাবে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে বড় ভাই সাথে না গেলেই হয়। সে ইঙ্গিতে একজনকে বলে দিলো, মলমূত্রের স্যাম্পল যেনো গোপনে সাথে নেওয়া হয়।

কিন্তু কপালে বিপদ থাকলে যা হবার তাই হলো। জমির আলী কোনোমতেই বাড়িতে থাকতে রাজি হলেন না। শত হলেও একমাত্র ভাতিজা। এমন মুমূর্ষু রোগীর সাথে না গেলে মনুষ্যের কাজ হবে? কাজেই তিনি হাসুর সাথে আগে আগে রওনা দিলেন।

শেষ পর্যন্ত যা হওয়ার, তা-ই হলো। জমির আলী হাসুকে এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানায় নিয়ে গেলেন। ডাক্তার সব হাল-হকিকত শুনে কয়েক পুরিয়া ঔষধ দিলো, আর বললো, দুদিন পর অবস্থা জানাবেন। এ ঔষধে কাজ না হলে ঔষধ বদলে দেব।

অবশেষে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নিয়েই তারা বাসার দিকে রওনা দিলো। লুকিয়ে আনা মলমূত্রের স্যাম্পলও কাজে লাগলো না। ধরম আলী ভাবলো, ঠুঙ্গার ভেতরে নেওয়া মলমূত্রের পুটলিটা আর বাসায় ফেরত নিয়ে লাভ নেই। সে সকলের অগোচরে সেই পুটলিটা রাস্তার এক কোনায় রেখে দিয়ে পথ চলতে লাগলো।

কিছুদুর গিয়েই পেছনে ফিরে তাকালো ধরম আলী। দেখতে পেলো, এক নেংটা টোকাই সে পুটলিটা কুড়িয়ে পেয়ে মহাখুশি।

মনের আনন্দে সে পুটলি নিয়ে দৌড় দিয়েছে তার মা'র দিকে।

সেই জন্মদিনের ড্রেসে

কলেজটিতে বছর পাঁচেক যাবত ডিগ্রি ক্লাসের অনুমোদন পাওয়া গেছে। প্রথম বর্ষ থেকে ডিগ্রি ক্লাস পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা অনেক। ছাত্র আছে, ছাত্রীও আছে। তাদের কলকাকলীতে কলেজের প্রাঙ্গন মুখরিত। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা দেওয়ার সময়। আড্ডার ভালো ব্যবস্থাও আছে। কলেজের সামনে বিরাট বটগাছ। তার চারপাশ গোলাকারে পাকা করে বাঁধালো। বিস্তৃত বটশাখার ছায়া। আড্ডা মারার মনোরম পরিবেশ বলতে যা বুঝায় তা ষোলকলায় পরিপূর্ণ। এদিক সেদিক আরো কয়েকটা গাছ আছে। আম জাম কাঁঠাল কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি গাছ। বটবৃক্ষের তলায় ভিড়টা একটু বেশি বলে গুটি কতককে কৃষ্ণচূড়া ও জামগাছের গোড়াতেও দেখা যায়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য আছে মিলনায়তনও। ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদা ব্যবস্থা থাকলেও এ ব্যাপারে কড়াকড়ি নেই। অনেক সময় নিছক আড্ডাই নয়, একত্রে বসে যে লেখাপড়া হয়না তাও না। সুতরাং আলাদা বসার যুক্তি অবান্তর।

উপজেলা পর্যায়ের কলেজ। উপজেলার সব এলাকার শিক্ষার্থীরাই এ কলেজে পড়ে। তবে মেধার দৌড়ে যারা এগিয়ে তারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পায়, আর যারা সামর্থ্যের দৌড়ে এগিয়ে তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে তবেই বাড়ি ফেরে। উভয় দৌড়েই যারা নিরুত্তাপ তারা এ কলেজে পড়েই নিজেদের মান রক্ষা করে। তবে উপজেলা পর্যায়ের কোনো কোনো আলালের ঘরের দুলাল একেবারেই যে থাকে না, তা নয়। তাদের অনেকে বাড়ি থেকেই আসে, কেউ কেউ আবার হোস্টেলেও থাকে। ছেলেরা পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে আসে। দূরের মেয়েরা তা পারে না বলেই তাদের হোস্টেলেই একটা বন্দোবস্ত করতে হয়।

শহরে চলে আধুনিক জীব ছেলে মেয়েদের মেলামেশায় তেমন বাধা থাকে না। আর এ কলেজের অধি ছেলে মেয়েরাই গাঁয়ের রক্ষণশীল পরিবেশ থেকে আসে। হোস্টেলে এসে এসব খাঁচার পাখি স্বাধীনভাবে ডানামেলে উড়ার সুযোগ পায়। মুকুলিত ফুলকুঁড়ি যেনো পাপড়ি মেলে দেয়। উঠতি ভ্রমরের বর্ধিষ্ণু ঘ্রাণশক্তি পুষ্পরাজির মধুর প্রতি আকর্ষণ করে। পুষ্পগুলোর মধ্যেও উড়ন্ত ভ্রমরগুলোকে কুক্ষিগত করার জন্য চলে আকর্ষণের প্রতিযোগিতা।

রীনা হোস্টেলে থাকে। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। প্রথমে সে লাল পাড় ও সবুজ রঙের সুতির শাড়ি পরে কলেজে আসত। পায়ে চেপ্টা সেন্ডেল। লম্বা সাদা ব্লাউজে গতর এবং শাড়ির আঁচলে মাথা ঢাকা। এখন ওর অবস্থা বদলে গেছে অনেকখানি। গাঁয়ে জামদানী শাড়ি, শর্ট ব্লাউজ। পেটের উন্মুক্ত চিকন ভাজ নিরবে আহ্বান জানায়। হাই হিল দামী জুতো। শ্যাম্পু করা চুল বাতাসে নাচে। নাক কান গলায় হালকা স্বর্ণের অলংকার। এগুলোর মাঝে মাঝে বসানো পাথরগুলো রোদের আলো ও বৈদ্যুতিক বাতির আলোতে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেয়। রীনা লাকী মেয়ে। কপাল ফাটা ভাগ্য। এতসব দামী জিনিসের জন্য তার বাপকে কষ্ট করতে হয় না। সব কিছুই গিফ্‌ট হিসেবে পাওয়া। এ গিফ্‌ট পাওয়াও একেবারে সোজা। কোনো ছেলের দিকে একটু আঁড় নজরে তাকালে অথবা একটু মুচকি হেসে একটু কথা বললেই বা কি হয়? দু'এক দিনে বড়জোর কয়েক মিনিট ব্যয় হবে, যা জীবনের অফুরন্ত সময়ের মাঝে আর কতটুকু। ব্যাস, নির্ঘাত চলে আসবে একটা গিফ্‌ট।

ওদের মধ্যে রফিককে বেশি ধনী মনে হয়। মটর বাইক চালায়। চোখে সানগ্লাস। ঘড়িটাও বেশ দামী মনে হয়। জিন্‌সের প্যান্ট পরে, যার হাঁটুর দিকে একটু ছেঁড়া। এমন ছেঁড়া ফ্যাশনের প্যান্ট বেশ দামী। গোটা কলেজে একমাত্র সেই এ ধরনের প্যান্ট পরে, রীনার লাল জামদানীটা তারই দেওয়া।

ফয়েজও ধনী। তবে রফিকের মতো ততটা নয়। রীনা ফয়েজকেও হাতছাড়া করতে চায় না। ওর সাথেও টিপ্পনি কাটে। ভাল্‌লাগার ভাষায় কথা বলে। সেদিন ফয়েজ রীনাকে বললো,

সন্ধ্যার দিকে একটু বটতলায় এসো।

কেন? কী ব্যাপার?

এসো। তখনই দেখবে।

বরং দিনে আসি। কেউ যদি দেখে ফেলে ...!

না, সন্ধ্যায়ই এসো। খুশি হবো।

রীনা রাজি হয়ে গেলো। কারণ 'খুশি হবো' কথাটার অর্থ সে বুঝে। দিনের আলোকে মুক্তি দিয়ে সে এলো সন্ধ্যার দিকে, যখন আঁধার নেমে এসেছে প্রায়। ফয়েজ হাত বাড়িয়ে দিলো রীনার দিকে। তার ব্লাউজের নিচে পেটের যে উন্মুক্ত চিকন ভাজ সেখানে স্পর্শ করতেই মৃদু কেঁপে উঠল রীনা। কম্পিত ওষ্ঠে বললো, কী করছ? রীনার কানের কাছে তপ্ত নিঃশ্বাসের জানান দিয়ে ফয়েজ মৃদুভাবে বললো, বড় মিষ্টি তুমি।

ছি ছি, এভাবে ধরো না। আমার সুরসুরি লাগে।

ফয়েজ এবার আরো মৃদুভাবে বললো,

তা হলে উপরে। মালিশ করে অসম উচ্চতা মিলিয়ে দিই!

নটি বয়! মিলিয়ে দিলে কার ক্ষতি? পরে যখন অন্ধকারে হাতড়াবে!

তখন পথিকই পথ সৃষ্টি করে নেবে।

তুমি একটা শয়তান। যাও তো!

আচ্ছা যাব। তবে তোমার গিফ্‌টা তো দেওয়া হলো না।

তবে দাও।

কিন্তু একটু আদর না হলে ...

দুষ্টু ছেলে! যাও, এখন একটু, বেশিটা পরে।

ঠিক আছে, এ বলে ফয়েজ ওর হাত টেনে হাতে পরিয়ে দিলো এক দামী ঘড়ি। এরপর ঘাড়ে এক চুমু এঁকে দিলো। রীনা বললো, তুমি যে কি না!

রীনার চিন্তায় যুক্তি আছে। একটু আবেগ বা রোমাঞ্চ দেখিয়ে যদি এতো মূল্যবান কিছু পাওয়া যায়, তাতে ক্ষতি কী? একটুতে তো তার দেহের কোনো ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে না। বরং যার সাথে তার ঘর হবে, সে তো পাবে পুরো স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠি।

বাকেরের অবস্থা ততো ভালো না। কিন্তু সে কবিতা লেখে। সে হৃদয়ের গভীরতা দিয়ে সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে। রাতে চোখ বন্ধ করলেই সে রীনাকে দেখতে পায়। সেদিন সে সারারাত ঘুমাতে পারেনি। সারারাত সে রীনাকে পাশে কল্পনা করে এক বড় কবিতা লিখে, যার শুরুটা হলো এরূপঃ

তোমার কথা বাজে মিষ্টি সুরে
মধুর কামনায় শত ভ্রমর ঘুরে
ফুল বাগানে তুমি মধুভরা ফুল
তুমি ছাড়া আমার জীবনটাই ভুল।

স্বভাবতই কবির কাছে কবিতার চেয়ে মহামূল্যবান গিফট জগতে আর নেই। এ ধরনের মনোভাব থেকে বাকের সেদিন একটি অসমাপ্ত কবিতা রীনাকে কলেজের বারান্দায় গিফ্‌ট দিল। রীনা তা মুচকি হাসিতে গ্রহণ করাতে সে আনন্দে উদ্বেলিত।

সে ভাবলো, যদি একদিন তাদের মিলন হয়, তা হলে সে রীনাকে শুনাবে তার রাত জাগরণের কথা, সমাপ্ত করবে তার অসমাপ্ত কবিতার পথযাত্রা। কল্পনায় তার মনপ্রাণ হয়ে উঠলো রোমাঞ্চিত।

এরই মধ্যে হঠাৎ করে রফিকের কথা মনে পড়লো রীনার।

পরের দিন।

রফিক ইঙ্গিতে রীনাকে বটতলায় ডাকলো। রফিকের হাতে ক্যাটব্যারি চকলেট। এ চকলেট রীনার খুবই পছন্দ। সে তো মহাখুশি। তাকে এতো খুশি দেখালো যে, লোকজন দেখে ফেলার ভয় না হলে সে হয়তো তাকে জড়িয়ে ধরে দু'গালে দুটো চুমু বসিয়ে দিতো। রীনা এদিক সেদিক তাকিয়ে পরে চকলেটের একটা কিউব রফিকের মুখে উঠিয়ে দিলো। এমন ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে রফিক রীনার হাতে হাত রেখে বললো,

তুমি কি লেহেঙ্গা চেনো? প্রথমটায় রীনা একটু বিচলিত হলেও পরে ন্যাকামীর সুরে মৃদুভাবে বললো,

লেহেঙ্গা কী?

লেহেঙ্গা হলো ভেরি স্পেশাল ড্রেস। ইন্ডিয়ান ড্রেস।

ওমা, তাই নাকি! এবার যেনো প্রাপ্তির লিপ্সা থেকে কোনো এক আত্মহারা সুখে উদ্বেলিত হয়ে বললো, খুব সুন্দর, তাই না?

সুন্দর তো বটেই। এ ড্রেসে তুমি আর রীনা থাকবে না। তুমি হয়ে যাবে রাজকুমারী।

এবার যেনো একান্ত আহ্লাদে রীনা অধিকতর আপনজনের মতো বলে উঠলো,

আমাকে যে ড্রেসের কথা বলছো, আমার ভাগ্যে কি তা আছে! এতো পয়সা কোথায় পাবো? তা এর দাম কেমন হবে?

ধরো দশটা জামদানী শাড়ির দামের সমান।

ওরে বাবারে! এতো দাম দিয়েও কি কেউ একটা ড্রেস কিনে? রাখো, ওসব কথা। ধরাতলে বসে আমি আকাশে উড়ার কল্পনা করতে চাই না।

কেন উড়তে চাও না? আমি তোমাকে একটা লেহেঙ্গা দিতে চাই।

এতক্ষণে রীনার লোলুপ জিহ্বটা যেনো আর মুখের মধ্যে স্থির থাকতে চাইলো না। তারপরও সংযতভাবে খানিকটা ঢং করেই বললো,

আর গাজাখুরি কথা বলো না। রাখো সব আজগুবি কথা।

তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?

না।

কেনো? আমি কি কখনো তোমার সাথে মিথ্যা বলেছি?

বলোনি। তবে হয়তো এটাই প্রথম মিথ্যা আশ্বাস।

রফিক এবার খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাসে রীনার মিথ্যা আশ্বাসের ধারণা ভুল প্রমাণের জন্য বললো,

মিথ্যা নয় প্রিয়ে। তুমি নিলে আমি দেবো।

রীনার চোখে মুখেও এবার এক প্রশান্তির ছায়াপাত হলো। সে বলে উঠল,

সত্যি! সত্যি বলছো!

সত্যি। সত্যি। সত্যি বলছি। আমি তোমাকে দিতে চাই। কিন্তু একটা শর্ত আছে।

রীনা খানিকটা আহ্লাদমিশ্রিত সুরে বলে উঠল,

কী শর্ত? আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না।

বিশ্বাস না হলে বলবো না! থাক। এবার যাই।

শিকারীর হাত থেকে পলায়নরত শিকারকে কব্জাগত করতে শিকারীর যেমন তাগাদা বেড়ে যায়, ঠিক তেমনি রীনাও যেনো উপায়ান্তর না দেখে বলে উঠল,

সরি, মাই ডিয়্যার। সরি বললাম তো। বিশ্বাস করলাম। এবার বলো, শর্ত কী?

শর্ত সোজা। এমন একটা ড্রেস, আমি নিজ হাতে তোমাকে পরিয়ে দিতে চাই।

রাজি? তা হলেই দেবো।

রীনা একটু লজ্জা পেলো, না লজ্জার ভান করলো, ঠিক বোঝা গেল না। তবে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়েই বললো,

রফিক, তুমি পাগল হয়েছো? কী বলছো তুমি? বিয়ের আগে কি তা সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়? বিয়ে তো শুধু একটা কলেমা। কবুল বললেই হয়ে গেলো। তাতে এ আমরা তো সেই আমরাই থাকবো।

রীনা সম্মতি দিলো না। তবে রাতে শুয়ে শুয়ে লেহেঙ্গার কল্পনায় সে উদ্বেলিত। মনে মনে সে লেহেঙ্গা প্রাপ্তির অনুকূলে সব ধরনের যুক্তি দাঁড় করাতে চেষ্টা করলো। সে ভাবল, বিয়ে হলে তো কোন পুরুষ কাপড় পরাবে, খুলবে ...। লেহেঙ্গার মতো একটা ড্রেস পেতে যদি ... ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে প্রায় সপ্তাহ ধরে রীনা কল্পনার আকাশে ভাসতে লাগলো। এরপর একদিন দু'জনে আবার বটতলায় একত্রিত হলো। রীনা বললো,

দুষ্টু ছেলে, তুমি যে আমাকে লেহেঙ্গা পরিয়ে দিতে চাও, কোথায় পরাবে সে কথা ভেবেই তো আমি রাজি হইনি।

সে ব্যবস্থা আমি করবো। তুমি রাজি কি না বলো।

কোনো কোনো নারীর বোধ হয় এটাই বড় সমস্যা। সতীত্ব যাবে যাক, কিন্তু সমাজ ঠিক রাখতে হবে। কেউ না দেখলেই হলো।

রীনা বললো, কিন্তু আগে বলো কোথায়?

অনেক কথা হলো। তারপরও রফিকের প্রস্তাবে রীনা রাজি হতে পারলো না। অতঃপর রফিক তাকে আরো দু'দিন চিন্তা করে দেখতে বললো।

দু'দিন পর।

সন্ধ্যা ছয়টায় সালোয়ার-কামিজ পরে রীনা রফিকের মটর বাইকের পেছনের সিটে বসলো। কিছুটা লজ্জিত শিহরণ, আবার প্রত্যাশার লেলিহান আনন্দ। অবশেষে তাদের হোটেলে পৌছতে পৌছতে রাত আটটা বেজে গেলো। অতঃপর রীনার শর্ত অনুযায়ী রফিক হোটেল রুমে বাতি নিভিয়ে আলতোভাবে ওর সালোয়ার-কামিজ খুললো এবং নিজ হাতে লেহেঙ্গা পরিয়ে দিলো। রীনা একটু লজ্জা পেয়েছিলো, কারণ বাইরে লাইট জ্বলে থাকায় রুমে ততো অন্ধকার হয়নি। জানালার কাঁচ দিয়ে কিছুটা আলোক রশ্মি ঢুকতে বেগ পেলো না। যাক, লজ্জা একবার ভেঙ্গে গেলে মেয়ে মানুষ যে কতটা কী হতে পারে, তা রফিক কিছুটা টের পেল। পরের দিন বিকেলে রফিক আবার ওকে লেহেঙ্গা পরিয়ে হোস্টেল ত্যাগ করলো। এবার রীনা আর লজ্জা পায়নি। তবে কথাটা কানাকানি হতে হতে জানাজানি হয়ে গেলো। এতে ভীষণ ক্ষেপে গেলো ফয়েজ।

পাঁচদিন পর হঠাৎ রীনা গুম। কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই এতে ব্যথিত। বাকের মনের যাতনায় আনমনে নদীর তীরে পায়চারি করতে লাগলো। অন্যমনষ্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে সে অনেক দূরে চলে গেলো, যেখানে নদীটি জঙ্গল ছুঁয়ে চলে গেছে। হঠাৎ সে আঁতকে উঠলো, জঙ্গল ঘেরা নদীর তীরে রীনার নিস্প্রাণ দেহ চিত হয়ে শুয়ে আছে। তার গায়ে লেহেঙ্গাও নেই, এক টুকরো কাপড়ও নেই।

তার নিরব নিথর দেহ ঢেউয়ে ঢেউয়ে আছাড় খাচ্ছে, সেই জন্মদিনের ড্রেসে।

হিরণ

গভীর রাত। রাস্তার দু'পাশের লাইটগুলো নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও ঘরে ঘরে এখন নিঝুম আঁধার। বাসার সামনে শিকলে বাঁধা যে কুকুরগুলো আগন্তুকদের ঘেউঘেউ করে প্রভু ভক্তি জানায়, তারাও লম্বা হয়ে শুয়ে সামনের পায়ের উপর মাথা এলিয়ে দিয়েছে। কানগুলো নেতিয়ে মাটি ছুঁয়েছে। আবাসিক এলাকার এ গলিপথে আর কোনো মানুষের আনাগোনা নেই। পাশের গাছে হঠাৎ একটা কাক কা কা করে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিলো খানিকটা। এ গহীন রাতে তার কা কা কা করার কথা নয়।

হিরণ ও তার বউ ফায়যা একতলা বাসার বাইরে সিঁড়ির বাঁ দিকে কুঁজো হয়ে বসে আছে। ফায়যার নাকে সর্দি। মাঝে মাঝে নাক বন্ধ হয়ে গেলে সে নাক ঝাড়তে চায়। হিরণ সাবধান করে দেয়। আওয়াজ করো না। আওয়াজে শান্তা যদি জেগে উঠে, তা হলে ঝাটা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে।

শান্তা হিরণের পালক ছেলে ইমরানের বউ। যেমন তেমন মেয়ে নয়। পয়সাওয়ালা ব্যবসায়ীর মেয়ে, তার উপর আবার মেট্রিক পাশ। তার দাপটে ঘরের বিড়ালটা পর্যন্ত ভয়ে দৌড়ে পালায়। হঠাৎ করেই পাগলের মতো প্রলাপরত এক ব্যক্তি এসে হিরণ ও ফায়যা যে জায়গায় বসেছিল তার সম্মুখে রাস্তায় যাত্রাপথে বিরতি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আস্তে করে ঘাড় ঘুরিয়ে হিরণকে লক্ষ্য করলো এবং কোনো সাড়া-শব্দ না করে আবার চলতে শুরু করল। প্রথমটায় হিরণ ভেবেছিল পাগল, খানিক পরে বুঝতে পারল মাতাল। ঘুমিয়ে থাকা ফায়যার দিকে তাকিয়ে হিরণের অদ্ভুত রকমের এক মায়া হলো। পরক্ষণেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দূরের কিন্তু পরিচিত এক ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে গেল হিরণ।

সে বছর পাটের ব্যবসার জন্য কাঞ্চিনগর পাড়ি জমিয়েছিল। সারাদিন পাট ক্রয় করে গঞ্জের গুদামে জমানোই ছিল নিত্যদিনের কাজ। গুদামের পাশেই চায়ের যে দোকানটি সেখানে বসেই হিরণ সব খেয়াল করলো, মেয়েটি প্রতিদিন তার দিকে আড় নজরে তাকায়। তার চোখে মুখে কামনার আবেদন। এ মাধুর্যে ক্লান্তি হারিয়ে গেছে হিরণের। ঘুম আর আসে না। কাজের শেষে ক্লান্তির যে অবসাদ দেহকে অসার করে দিতো, তা এখন আর নেই। মধুর কল্পনায় দেহমন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় কাটে দিন রাত। তার কিছু দিন অতিক্রান্ত হতে না হতেই এক মধুর লগনে দু'জনে কথা হয়। তখন থেকে চলে হৃদয়ের লুকোচুরি খেলা। শেষ পর্যন্ত তাদের বিয়ে হয়। চলে সে কামনার জীবন। এভাবে দিন যায়, জন্ম হয় এক ফুটফুটে পুত্র সন্তানের। পরের ঘটনা স্মরণ করে হিরণের দেহ কাঁটা দিয়ে ওঠে। নিজের প্রতি জাগে ঘৃণা। হয় অনুতপ্ত। ছোট্ট ছেলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় সবেমাত্র কথা বলে। গালে চুমু খায়। এমন আদরের ছেলে ও মায়াবী বউ ছেড়ে হিরণ দেশে চলে আসে। বীনা হাত জোড় করে, গলায় জড়িয়ে ধরে। ছেলে বুঝতে না পেরে মা'র সাথে সাথে নিজেও বাবাকে জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু শত অনুনয় বিনয়েও হিরণের মন গলেনি। সে এক হেচকা ধাক্কায় তাদের ফেলে হাঁটা দিলো।

বিদেশি হয়েও যাকে আমি আমার যৌবন ও হৃদয় মন সপে দিলাম সে আজ এমন ধোঁকা দিয়ে চলে যায়, সে বিচার তোমার কাছে দিলাম বলে হাত তুলে বারবার আহাজারী করলেও হিরণের দেখা বীনা আর কোনোদিনই পায়নি।

স্মৃতির কল্পনার জগতে হিরণ হারিয়ে গিয়েছিল চোখের সামনে দিয়ে ফুৎ করে একটা তেলাপোকা উড়ে যেতেই এতক্ষণে সে চেতনায় ফিরে এলো। পাশে ফায়যা মাটিতে শুয়েই ঘুমাচ্ছিল। হিরণের চোখে ঘুম নেই। তাকে আচ্ছন্ন করে আছে স্মৃতি, অনুতাপ আর যাতনা নামক কতগুলো যন্ত্রণা। এমন সময় এক রিকশা চলে গেলো রাস্তা দিয়ে। ভাবলো, এতো রাতে কেন এ রিকশা। কারো কি অসুখ? নাকি কেউ কি তারই মতো কোনো আপনজনকে ধোঁকা দিয়ে চলে যাচ্ছে! মনে মনে ভাবে হিরণ।

রিকশা চলে গেলো। অনেকগুলো এলোমেলো ভাবনা থেকে সৃষ্ট অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেতে হিরণ মাটির উপরই ফায়যার কাছে শুয়ে পড়লো। কাপড়ের যে পুটলিটা সে হাতে নিয়ে বেরিয়েছে, সেটাকেই মাথার নিচে রাখলো বালিশের

মতো। চোখ বুজে একটু ঘুমাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু আজ তার চোখে ঘুম নেই। গত জীবনের স্মৃতিগুলো যেনো বাস্তব ঘটনা হয়ে তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। এ যে ফায়যা তার পাশে শুয়ে আছে, তার কথাও মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে ছিল অন্যের ভরা ঘরের গিন্নী। ছেলে মেয়ে নিয়ে সুন্দর সংসার। কিন্তু কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে তার সাথে হয়ে গেলো হিরণের চূড়ান্ত পরিণতি। চললো নতুন জীবন। দু'জনে রাতদিন কঠিন পরিশ্রম করে চললো। আজ বিশ বছর পার হয়েছে। কোলে কোনো সন্তান এলো না।

এমন সময় ফায়যা এপাশ থেকে ওপাশ ফিরলো। একবার হিরণের দিকে তাকিয়ে দেখলো তার চোখ বন্ধ। ভাবলো, বিছানা না হলেও সে মাটিতে ভালই ঘুমাচ্ছে। কাজেই ফায়যা আবার চোখ বন্ধ করলো। কিন্তু হিরণের চোখে ঘুম নেই। সব বন্ধ চোখই যে ঘুমে বন্ধ থাকে না এ সহজ কথাটাই ফায়যা বুঝল না।

হিরণ আজও ভোলেনি একটা সন্তানের কামনা তাকে পাগল করে ফেলেছিল। ফায়যা থেকে সন্তান পাওয়া সম্ভব নয় বলেই সে গোপনে আরেক বিয়ের পরিকল্পনা করে। দু'একজন বন্ধুর সহায়তায় বিয়ে করে ভৈরবের তিন্নি নামের মেয়েকে। বীনা যেনো তিন্নি হয়ে নবরূপে দেখা দিল। হিরণের মনে নতুন আশার সঞ্চার হলো। আবার এক সন্তানের দেখা পাবে। কোলে এসে বসবে। ঘরে আসবে নতুন বসন্ত।

হিরণের এখনো মনে পড়ে, ফায়যা প্রথম দিকে তিন্নিকে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু অবশেষে স্বামীর মনোকষ্টের কথা বুঝতে পেরে সে তিন্নিকে মেনে নিলো। রাতদিন চেষ্টা চললো একটা নতুন মুখের প্রত্যাশায়। কিন্তু সে আশার গুড়েবালি। কাঙ্ক্ষিত সন্তানের সৌভাগ্য আর হয়নি। সুতরাং সন্তানের উদ্দেশ্যে ভরা যৌবনের যে তিন্নিকে ঘরে আনা, তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় একটা সময়।

কল্পনার উল্কায় চড়ে হিরণ চলে গিয়েছিল অতীতে। এমন সময় বাধ সাধলো এক বেয়াদব গাড়ি। রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটা গাড়ি এসে পুঁ করে বাঁশি বাজালো। এতে অনেকের ঘুম হয়তো ভেঙ্গে গেলো না কিন্তু হিরণ ভয় পেলো, না জানি শান্তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়। ঘরের ভেতরে একটু খট্ করে আওয়াজ হলো। ফায়যা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হিরণকে বললো, এটা কি শান্তা? সে যদি আমাদের দেখে ফেলে? হিরণ

বললো- চুপ, সে টের পেয়ে যেতে পারে যে, আমরা এখনো এখানে আছি।

এতক্ষণে শান্তা দরজা ফাঁক করে উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখে ফেললো। সে বেরিয়ে এসে বললো, আপনাদের আমি বলেছিলাম চলে যেতে। তবু এখানেই রয়ে গেলেন। এটা কেমন বেয়াদবী! ইমরান তো আপনাদের আপন ছেলে নয়। আপনারা কেনো এতো বিরক্ত করছেন? অন্যদেরকে এভাবে কষ্ট দিতে লজ্জা হয় না? সকাল সাতটার ট্রেনে আমার আব্বা-আম্মা ও ভাইবোন আসবে। আর মাত্র কয়টা ঘণ্টা বাকী ? তারা এসে এমন ঝামেলা দেখলে কী মনে করবে?

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলেই খট্ করে দরজা বন্ধ করে দিলো শান্তা।

নাবলু

সিরিয়াস চিন্তার সময় হাতেম সাহেবের এমন হয়। গোল ফ্রেমের চশমাটা নাকের ডগার দিকে নেমে আসে। তখন তার চোখের দৃষ্টি চশমার লেঞ্চের ভেতর দিয়ে যায় না, বরং তিনি ফ্রেমের উপর দিয়ে তাকান। এ সময় চশমা অকারণেই নাকের ডগায় ঝুলতে থাকে, কোনো প্রয়োজন ছাড়াই। চশমার লেঞ্চ ছাড়াই তিনি এতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকান যে তার দৃষ্টি লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে ওপাশে চলে যায়।

মিটিং-এ বসে হাতেম সাহেব এমনই গভীরভাবে বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। এরূপ গভীর অবস্থায় তিনি অত্যন্ত গরম কফি পছন্দ করেন। পাশে গরম কফির বাষ্প উবে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল করার সুযোগ তার হয়নি। অবশ্য সভাসদে কেউ এক হাতে কফির কাপ চুমুক দিয়ে সভার কর্মপত্রের দিকে লক্ষ্য করছে, কেউ কলম হাতে কিছু নোট করছে। কেউ কেউ চিন্তার গভীরতায় মাথা চুলকাচ্ছে, আবার কেউবা নাকের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে অকারণেই কিছু একটা করছে। টেবিলের কোনার দিকে যে বসে আছে সে তার চিন্তায় ভারাক্রান্ত মাথাকে টেবিলে কনুই ঠেকানো হাত দ্বারা ঠেকা দিয়ে বসে আছে।

অত্যন্ত সিরিয়াস বিষয়ে গভীর আলোচনা হচ্ছে সভায়। এমন সময় খট করে দরজা ফাঁক হলো। মাথাটাকে একটু ভেতরে প্রবেশ করিয়ে উঁকি মেরেই লোকটি বললো: স্যার, আমি নাবলু, আসতে পারি? হাতেম সাহেব কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু এক পলক তাকালেন। এতে করেই সে তার জবাব পেয়ে গেলো।

নাবলু হতচকিত হয়ে বললো: সরি স্যার; আমি একটু পরে আসি তা হলে।

আলোচনা গভীরতার শীর্ষে পৌঁছেছে। সবাই তাদের সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে চলেছে। সময়ও অনেকটা পার হয়ে গেছে। তবে মেহের সাহেব তখনো চুপ।

তিনি তার শেভবিহীন গালে গজানো উস্কো-খুস্কো দাড়ি চুলকাচ্ছিলেন। হাতেম সাহেব বললেন, কী ব্যাপার আপনি তো কিছুই ...!

এতক্ষণে মেহের সাহেব মুখ খুললেন, বললেন: বিষয়টি জটিল কি না, তাই ভালো করে ভেবে দেখছিলাম, তা আমি মনে করি ...!

মেহের সাহেব বাক্যটি শেষ করার আগেই দরজায় আবার খট করে আওয়াজ হলো। স্যার, আমি নাবলু। আসতে পারি? হাতেম সাহেব তাঁর দিকে আগের মতোই অন্য রক্তিম দৃষ্টিতে তাকালেন। তবে সে দৃষ্টি রাগ না বিরক্তির, তা বুঝে উঠার আগেই মারুফ সাহেব জবাব দিলেন: আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা একটা মিটিং-এ আছি এবং একটা বিশেষ বিষয়ে আলোচনায় রত।

সরি স্যার, নাবলু বললো, একটা জরুরি বিষয় ছিল কি না, তাই বিরক্ত করলাম। তা আমি বাইরেই অপেক্ষা করছি।

এবার হাতেম সাহেব কলিং বেল টিপলেন। তার সেক্রেটারি এলে একটু ধমকের সুরেই বললেন: তুমি বাইরে কী করো? জরুরি মিটিং হচ্ছে, আর বলা নেই কওয়া নেই লোক এসে ঢুকে যাচ্ছে!

সেক্রেটারি বললো: স্যার, আমি নিষেধ করেছি, তবু নাবলু সাহেব বললেন,

অতি জরুরি ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলা দরকার। নয়তো আপনারই বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। এ বলে অনুমতির তোয়াক্কা না করেই অনেকটা জোর করে দরজা খুলে ...।

মিটিং আরো ঘণ্টা খানেক চললো। বিকেল তিনটায় সভা শেষ করে শ্রান্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় হাতেম সাহেব বাসায় যাবার জন্য সভাকক্ষ থেকে বের হলেন।

স্যার, অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার, নাবলু বললো, আমি সেজন্য এখনো বসে আছি। একটু সময় দিলেই হবে।

ব্যস্ততায় হাতেম সাহেবের আজ ঠিক মতো নাস্তাও খাওয়া হয়নি। এখন ক্ষুধায় তার পেট চোঁ চোঁ করছে। এছাড়া ক্লান্তিতে দেহ অবসাদগ্রস্ত। তবু বললেন:

কী ব্যাপার, সংক্ষেপে বলুন।

একটু বসুন স্যার। বেশি সময় লাগবে না।

ঠিক আছে, আসুন। বলুন।

স্যার, খুলনার জমিটার ব্যাপারে ...। আমি অনেক শখ করে আপনাকে জমিটা কিনে দিয়েছি। আমার শখ একটাই। আমার মেয়ে নাবিলা ডাক্তারি পড়ে। আপনার মেয়েও মেডিকেলে পড়ে। আমার শখ এ জমিটাতে আপনি একটা মেডিকেল কলেজ করেন। আমার মেয়ে ও আপনার মেয়ে এ মেডিকেল কলেজ চালাবে। এটা হলে কবরে থেকেও আমি শান্তি পাব।

হুম, এটা তো নতুন কথা নয়। এজন্যই তো জমিটা কেনা। কিন্তু আপনিই তো বললেন জমিতে সমস্যা আছে। এর মালিক ছিল হিন্দু এবং তাদের অংশীদার আছে। অংশীদাররা মামলা করেছে। এরপর বললেন, এসব মামলা কতো বছর চলে, তার গ্যারান্টি নেই। আপনি এ জমি বিক্রয় করে দিয়ে নিষ্কণ্টক জমি কিনতে চান। এজন্য আমার নিকট থেকে 'পাওয়ার অব এটর্নি' করে নিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তো এখন সমস্যা কী?

জমি বিক্রয় করাতেও সমস্যা হয়েছে। তাই তো আসা। আমি একটা সুরাহার পথ বের করে এসেছি। দুদিনের মধ্যে সমাধান করতে হবে। তা না হলে জমি বিক্রয়ও করতে পারছি না।

তাই নাকি? কী সমস্যা হয়েছে? আর সুরাহাই বা কী?

সমস্যা এই যে, মামলা অবস্থায় জমিটা বিক্রয় করলে খুব কম দাম পাওয়া যায়। অনেকে কিনতে চায় না। সুরাহা হলো এই যে, পয়ত্রিশ লাখ টাকা হলে মামলাটা শেষ করা যায়। অংশীদাররা দাবী ছেড়ে দিয়ে মামলা উঠিয়ে নেবে। এ ৩৫ লাখ টাকা দু'দিনের মধ্যেই দিতে হবে। আমি খুলনার গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে সালিশি সভা করে অনেক কিছু বলে এ ব্যবস্থা করেছি। হিন্দু লোক তো স্যার, সবার কথা কি আর অমান্য করতে পারে? দেড় কোটি টাকার সম্পত্তির দাবি এখন পয়ত্রিশ লাখে ছেড়ে দেবে। কিন্তু টাকাটা দিতে হবে দুদিনের মধ্যেই। আমি দু'দিনের মধ্যে টাকা দেবো, ওদেরকে কথা দিয়ে তারপরই এসেছি। টাকাটা এখন ভালয় ভালয় দিতে পারলেই হয়। ব্যাংক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এজন্যই মিটিংয়ের মধ্যেও বার বার উঁকি দিয়ে বিরক্ত করছিলাম। দেরি না করে আমরা কি এখনই ব্যাংকে যেতে পারি স্যার? তা হলে আমিও আপনার সাথে যেতে পারি।

নাবলু এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলো। হাতেম সাহেব অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন। তাছাড়া এখনো তাঁর দুপুরের খাওয়া হয়নি। আর টাকা কি গাছে ঝাকি দিলেই ঝরে পড়ে? এছাড়াও তিনি কি নাবলু সাহেবকে দেওয়ার জন্য এতো টাকা ব্যাংকে জমা করে রেখেছেন নাকি? এসব ভেবে মনে মনে বিরক্তই হলেন তিনি। কিন্তু নিজের স্বভাবের বাইরে না গিয়ে শান্তভাবে বললেন, এক্ষুণি এতো টাকা আমি কোথেকে দেবো? কথা শুনে নাবলু একটু নিরুৎসাহিত হলো। আর হারিয়ে গেল নিরাশার কোনো এক অতল গহীনে।

সেদিন রাতে শুয়ে শুয়ে হাতেম সাহেব ভাবলেন, তিন বছর আগে প্রায় ছয় একর জমি কোটি টাকা দিয়ে কেনা। এখন তার দাম হবে দ্বিগুণেরও অধিক। কাজেই পয়ত্রিশ লাখ টাকা দিয়ে যদি মিটমাট করা যায়, তবে মন্দ কি! কিন্তু গোটা বিষয়টা নিয়েই তিনি দ্বিধায় ভুগছেন। মামলার কথা বলে নাবলু এর আগেও টাকা পয়সা অনেক নিয়েছে। এছাড়া জমিটা উঁচু হলেও বাঁধ দিয়ে সেখানে চিংড়ি চাষ হয়। হাতেম সাহেবের ছেলেমেয়েরা মূলত চিংড়ি মাছের শখেই জমিটা কেনার জন্য জোর দিয়েছিল। কিন্তু আজ তিন বছর হয়ে গেলো একটা চিংড়িও তাদের ভাগ্যে জোটেনি। এখন আবার পয়ত্রিশ লাখ টাকা চাওয়া হচ্ছে। হাতেম সাহেবের কাছে গোটা বিষয়টাই কেমন যেনো ঘোলাটে মনে হচ্ছিল।

পরদিন সকাল সকাল নাবলু এসে উপস্থিত। স্যার চলুন ব্যাংকে, নাবলু বললো, আজ টাকা না দিলে মামলাটা উঠানো যাবে না। আমি আপনার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য তাদের একাউন্ট নাম্বার নিয়ে এসেছি। ব্যাংকের মাধ্যমেই তাদের একাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিতে পারবো।

হাতেম সাহেব বিষয়টা নিয়ে মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে লাগলেন। তিনি কোনো মতে নাবলুকে এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু মানসিক দ্বন্দ্বের কোনো সুরাহা করতে পারলেন না। তিনি বন্ধু নাজমুলের সাথে ব্যাপারটি শেয়ার করলেন। নাজমুল যেনো তার দ্বিধার আগুনে ফুৎকার দিলো। নাজমুল নাবলুর আচরণ সন্দেহজনক আখ্যা দিয়ে বললো, এক্ষুণি খুলনা গিয়ে বিষয়টি তলিয়ে দেখা দরকার। সে নিজেই খুলনা যাওয়ার প্রস্তাব করলো। আর পরদিন সকালেই সে খুলনা রওনা হলো।

খুলনা গিয়ে নাজমুল নিদ্রাহীন রাতটা হোটেলে কাটালো এবং পরদিন সকালে অফিসের সময় হওয়ার সাথে সাথে সাব রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে উপস্থিত। তার কাজ হলো তল্লাশী করে দেখা, হাতেম সাহেবের জমিটা অন্যের নামে বিক্রয় হয়ে

গিয়েছে কি না। কাজেই সে সংশ্লিষ্ট অফিসারের দফতরে গিয়ে সামনের চেয়ারে বসলো এবং দলিল তল্লাশীর আবেদন করলো। কিন্তু দলিলের নাম দেখেই অফিসারের চেহারা লাল হয়ে গেলো। বর্ণচোরা গিরগিটির মতো কোন রং থেকে কোন রং ধারণ করলো তা নাজমুলকে বুঝতে না দিয়েই অফিসার বললো,

এ দলিলের তল্লাশী হবে না।

কিন্তু কেন? আমি তো প্রয়োজনীয় ফিস্ দিলাম।

না, ফিস্ দিলেও হবে না। ফিস দিলেই যে সব কাজ হয়, এ কথা কে বলেছে আপনাকে? কী বলবে নাজমুল ঠিক বুঝতে না পেরে করুণ দৃষ্টিতে তাকাতেই অফিসার বলে উঠল, নিষেধ আছে। উপরওয়ালার নিষেধ।

ভাই, আমার ভীষণ প্রয়োজন। করে দিন না কাজটা! যদি উপরি পয়সা কিছু লাগে ...।

কী বললেন? পয়সা? ভাগেন। এক্ষুণি উঠেন এখান থেকে।

এ যেনো রীতিমত ধমক। যাই হোক, তাকে দিয়ে যে কাজ উদ্ধার হবে না তা নাজমুলের বুঝতে বাকি রইল না।

তাই শত অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও অফিসার কোনোমতেই সেই দলিলের তল্লাশীতে রাজি হলো না। নিরুপায় দেখে নাজমুল ভাবলো, সবচেয়ে বড় অফিসার অর্থাৎ সাব-রেজিস্ট্রার সাহেবের সাথে দেখা করতে হবে। সুতরাং সে সাব-রেজিস্ট্রারের পিএস সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করলো। পিএস তাকে সাক্ষাৎকারের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বৃত্তান্ত খুলে বললো। সব শুনে পিএস বললো,

ওনার সাথে দেখা করা যাবে না।

কিন্তু কেন ভাই? একটু সাহায্য করেন না ! প্লিজ !

না, হবে না। এ দলিলের তল্লাশীর কাজে তার সাথে দেখা করা যাবে না। এ কাজে আপনাকে ঢুকতে দিলে আমার চাকুরি যাবে।

উপায়ান্তর না দেখে নাজমুল কিছুক্ষণ আশাহত হয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলো। এতক্ষণে আকাশচুম্বী আত্মবিশ্বাসের পাহাড়ের ভিত্তি যেনো কেঁপে উঠল এবং তা ভেঙ্গে পড়ার আগেই ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা

করে না, নাজমুলও ঠিক তা-ই করতে লাগলো। অফিসের বয়-বেয়ারার থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সবার সাথে কথা বলতে লাগলো, হয়তো বা কোন কূল-কিনারা হয়ে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত অফিসের দক্ষিণ কোনের ক্যান্টিনে চা খেতে বসে একই টেবিলের এক লোকের সাথে সে খাতির জমালো। তাকে বাইরের দোকান থেকে এক খিলি মিষ্টি পানও কিনে খাওয়ালো। খাতির ও মিষ্টি পানে যে কাজ হয়েছে তা সে বুঝতে পারল যখন লোকটি বললো, পকেট ভারি আছে তো? পকেট খালি হইলে কিন্তু কাজ হইব না।

কোনো অসুবিধা হবে না। যা লাগে আমি চেষ্টা করবো। একটু দেখুন।

না, আমি কিচ্ছু করতে পারবো না। পিএস-টিএস দিয়া কাজ হইব না।

আশা ভঙ্গের সুর বেজে উঠার আগেই লোকটি বলে উঠল,

সাব-রেজিস্ট্রারের আইন সহকারির সাথে কথা বলতে অইব।

নাজমুল খানিকটা উৎসুক হয়ে মাথাটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, আইনের সহকারি মানে? তিনি আবার কে? অফিসের সবাই তো আইন অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত।

তা, আপনি দেখি বড্ড মানুষ। বাংলা ব্যাকরণ কিছু পড়েন নাই নাকি?

হ্যাঁ, তা তো পড়েছি। বাংলা ব্যাকরণে আমি ৬৯ নাম্বার পেয়েছিলাম। এতে সবাই তো আমাকে ব্যাকরণের পণ্ডিত বলেই বাহবা দিয়েছিলো।

এ পাণ্ডিত্যে অইব না। শতকরা শ' পাইলে তবে কথা। আচ্ছা বাবু, সন্ধি-বিচ্ছেদ কি একেবারে ভুইল্যা গেছেন?

তা ভুলবো কেন? কথা অগ্রসর হবার সুযোগ না দিয়েই লোকটা বলে উঠল, ভুলছেন। অবশ্যই ভুলছেন। না হইলে 'আইন' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ বুঝলেন না কেন? বলেই সে পানের বোটায় করে আরেকটু চুন জিহবার উপরে লেপটে দিল।

তা আবার কী?

হ্যাঁ, এবার তো ধরা পইড়া গেলেন। নকল কইরা পাশ করছেন। তা না হইলে এর সন্ধি বিচ্ছেদ জানতেন। (আয়+ইন) দিয়ে আইন হয়। আর এর অর্থ হইল আয়কে ইন করা। অর্থাৎ আয় ঢুকানো বা অর্থ ঢুকানো। অর্থাৎ আপনার পকেটের

অর্থ সাব-রেজিস্ট্রার সাহেবের পকেটে ঢুকানোর জন্য আছেন সহকারি। তিনিই তাঁর আইন-সহকারি। আইন-সহকারি বললে তাকে সবাই চিনে। এবার যান, তাকে ধরেন। কাজ হইব। এ বলেই তার ঠোঁটে যেনো একটা বিজয়ের হাসি বয়ে গেল। নাজমুল বুঝল কাজ হয়েছে। তাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তিনি কোন রুমে বসেন ভাই? দূর থেকে ইঙ্গিতেই একটু দেখিয়ে দেন না।

আপনি দেখি বড্ড বোকা। শুধু বোকা না, বলতে হয় হাবা। আইনের মানুষ কি আর অফিসে বসে ভাই? তিনি পাখি। উইড়া বেড়ান।

ভাই, আমি তো উড়ন্ত পাখি ধরতে পারবো না, পাখির বাসাও খুঁজে পাবো না। কীভাবে ধরবো তাকে?

আচ্ছা বিপদ তো! তাকে কে না চেনে? আর সবার মোবাইল সেটেই তার নাম্বার সেইভ করা আছে। আচ্ছা, আমি আপনাকে তার নাম্বার দেই।

এ বলে সে নিজ মোবাইল থেকে তার নাম্বার বের করে দিলো।

নাজমুল মহাখুশি। অতি উত্তেজনায় ধন্যবাদ দিতে গিয়ে তার সাথে এমন জোড়ে হাত মেলালো যে, তার হাত মুচড়ে যাওয়ার অবস্থা।

এরপর এক মুহূর্ত দেরি না করে নাজমুল সাব-রেজিস্ট্রারের আইন সহকারিকে ফোন করলো। ভাগ্যিস, রয়েল হোটেলে বসে তিনি এ মাত্র আরেকজনের সাথে আইনের কাজ শেষ করেছেন। কাজেই সহজেই নাজমুল তার সাক্ষাৎ পেয়ে গেলো। অতঃপর দুজনে পাশের হোটেলে চায়ের টেবিলে বসে গেলো। চায়ের কাপে দু'জনেই চুমুক দিলো। এরপর স্বাভাবিক হয়ে নাজমুল বললো, আমার একটু সাহায্য প্রয়োজন। একটু সাহায্য চাই।

তা আপনি আমার নাম্বার পেলেন কোথায়?

আপনার নাম্বার কার কাছে না আছে? আপনাকে খুলনার সবাই চেনে। আপনার সাহায্যে তো সবাই ধন্য।

নাজমুল লক্ষ করলো বরফ গলছে। এতে উৎসাহিত হয়ে নাজমুল বাংলাদেশি তেল দেওয়ার পরিবর্তে ইতালিয়ান 'চীজ' দিতে লাগলো। আর যায় কোথায়? কাজ হলো পয়েন্টে পয়েন্টে। আইনের লোকটি বললো, তা আপনার কাজটা কী?

নাজমুল দলীল তল্লাশীর কাজটি ব্যাখ্যা করলো। আর তখনি আইনের লোকটি দলীল তল্লাশীর অফিসারকে ফোন করে বললো,

উনার দলীল তল্লাশীর কাজ এক্ষুণি করে দিন। আর হ্যাঁ, অফিসিয়াল ফিসের বাইরে যেনো একটা পয়সাও নেওয়া না হয়।

নাজমুল তাকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং আবার দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরাসরি তল্লাশী অফিসারের কাছে চলে গেলো। এবার নাজমুলকে মুখে কিছুই বলতে হলো না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তল্লাশী অফিসার খাতাপত্র দেখে সবকিছু বলে দিলো। তা শুনে নাজমুলের মধ্যে বয়ে গেলো টর্নেডো। মাথা ঝিমিয়ে একবার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। এ অবস্থা দেখে তল্লাশী অফিসার বললো,

কী ব্যাপার? আপনার কি শরীর খারাপ?

না, তেমন কিছু নয়। আপনার এখানকার বায়ু খুবই ফ্রেশ। তা আমি একটু যাই। বাইরে গিয়ে একটু...।

এ বলেই নাজমুল বাইরে গিয়ে হাতেম সাহেবকে ফোন করলো, আপনার জমিতে অংশীদারিত্বের কোনো দাবিদার নেই। নাবলু নিজে পয়সা দিয়ে দাবিদার সাজিয়েছে। আর আপনার দেওয়া 'পাওয়ার অব এটর্নি' দ্বারা আপনার জমি তার মেয়ে নাবিলার নামে দলিল করে তার পক্ষে নামও খারিজ করে নিয়েছে।

এ ফোন পেয়ে হাতেম সাহেব উত্তর-দক্ষিণ কিছু একটা বুঝার আগেই ক্রিং করে তার ফোন আবার বেজে উঠলো। তিনি হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে নাবিলার কণ্ঠ শুনতে পেলেন। নাবিলা কেঁদে কেঁদে বললো : কাকা, আব্বু মনে হয় স্ট্রোক করেছেন। তার হুশ নেই। তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে।

হাতেম সাহেব দ্রুত গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে শুধু বললেন, তাড়াতাড়ি চলো।

গুম

চলছে মহা হৈ-চৈ। ঝর্ণার মা ছোট তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে তোলপাড় কাণ্ড করে বসেছে। দেওয়ালে মাথা ঠুকছে, চুল টেনে ছিড়ে ফেলতে চাচ্ছে, শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, আর চিৎকার করে বলছে, আমি আমার মেয়ে চাই। আমার মেয়েকে বের করে দেন। আপনারা কোথায় তারে লুকাইয়া রাখছেন? তারে কি সত্যি মাইরা ফালাইছেন? আর চলছে অবিরাম আহাজারী।

ঝর্ণার মা তার আদরের মেয়ে ঝর্ণাকে শহরে কাজ করতে দিতে চায়নি। সে শুনেছে, শহরে কাজের ঝিদের উপর অত্যাচার হয়, শ্লীলতাহানি হয়, এছাড়াও হয় পাশবিক নির্যাতন। এমন কি গিন্নিরা কখনো আঘাত করতে করতে ঝিকে মেরে ফেলে। আবার বাড়ির কর্তাদের অবৈধ সম্পর্কের কারণে কোনো দুর্ঘটনার আলামত যদি পাওয়া যায় তখন কর্তারাও নাকি ঝিদের হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলে। ঝর্ণার গুম হওয়ার কথা শুনে অনেকেই ভাবছে, এমন কিছু একটা হয়ে থাকতে পারে। তা না হলে বাড়ির কর্তা তাহের সাহেব ও তার স্ত্রী স্বপ্না কেন ঝর্ণার গুম হওয়ার খবর জানালো না, আর কেন এখনো তার হদিস দিচ্ছে না।

ঝর্ণার মা'র আহাজারি ও কান্নাকাটি শুনে বহুলোকের সমাগম হয়েছে। অনেকেই ঝর্ণার মা'র পক্ষ নিয়ে কথা বলছে। কেউ বলছে, ঝর্ণা আপনাদের কাজের বুয়া, এ যুবতী মেয়েটির দেখভাল করা আপনাদেরই দায়িত্ব ছিল। কাজেই এর জবাব আপনাদেরই দিতে হবে। জিজ্ঞেস করে জানা গেলো, তাহের সাহেব ঝর্ণার গুম হওয়ার খবর পুলিশকেও দেননি। থানায় পর্যন্ত কোনো জিডিও করা হয়নি।

ইতোমধ্যে পুলিশ এসে উপস্থিত। পুলিশ লোকজনকে থামাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ঝর্ণার মা'র আহাজারিতে গোটা পরিবেশই বিষণ্ন হয়ে উঠলো। ঝর্ণার কী হয়ে থাকতে পারে, নানাজন নানা কথা বলে চললো। কেউ কেউ তাহের সাহেব

ও তার গিন্নীকে নানাভাবে দায়ী করে চললো। পুলিশ বেগতিক দেখে সবাইকে চলে যেতে বললো। এরপর পুলিশ তাহের সাহেব, তার স্ত্রী ও ঝর্ণার মা'কে নিয়ে বিষয়টি তলিয়ে দেখার জন্য থানায় রওনা দিলো।

ঝর্ণার মা থানার ওসিকে তাদের পরিবারের কথা বলতে লাগলো। ঝর্ণার বাপ অন্যের জমিতে কামলা দিয়ে দিন গুজরান করতো। কিন্তু গাঁয়ে দু'দলে ঝগড়া হয়। এতে তিনজন মানুষ মারা যায়। কামলা হলেও একটি দলের সদস্য হওয়ার কারণে সে রক্ষা পায়নি। এক রাতে বাজার থেকে ফেরার পথে তার উপর আক্রমণ হয়, যার ফলে সে এখন পঙ্গু। কোনো উপায়ান্তর না দেখে তার মেয়ে ঝর্ণা তাদের গ্রামেরই তাহের সাহেবের বাসায় কাজ নিয়ে শহরে আসে। যুবতী মেয়েকে শহরে পাঠাতে ঝর্ণার মা'র মনে দ্বিধা ছিল। কিন্তু নিরুপায় হয়ে মেম স্বপ্নার কথায় রাজি হয়ে তার বাসায় কাজ করতে দেয়। এমন ঘটনা যে ঘটবে, তা সে কখনো ভাবেনি। ঝর্ণার মা ওসির দু'পা জড়িয়ে ধরলো এবং বললো: বাবু, আমার মাইয়ারে বাঁচান, তারে না পাইলে আমি জীবন দিয়া দিমু। আল্লাহই জানে সে কোনখানে কী বিপদে আছে।

ওসি ঝর্ণার মা ও তাহের সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, যৌবনের ভরা-দেহের মেয়ে ঝর্ণা। গরিব হলেও দেহে তার প্রাচুর্য। যে কোনো যুবকের দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারে সে। জিজ্ঞাসাবাদে ওসি কোনো বিশেষ ক্লু পেলেন না বটে, কিন্তু তার মনে কোনো সন্দেহ কাজ করছে বলে মনে হলো। তাহের সাহেবের স্ত্রীর সাথে কথা বলে ওসি জানতে পারলেন, পাশের বাসার কাজের মেয়ে শিল্পীর সাথে ঝর্ণার বেশ সখ্য ছিল। কাজেই তিনি একজন পুলিশ অফিসার পাঠালেন শিল্পীকে নিয়ে আসার জন্য। শিল্পী থানার কথা শুনে ভীত হয়ে পালাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পুলিশ তাকে এক প্রকার জোর করেই থানায় নিয়ে এলো। ওসি শিল্পীকে ঝর্ণা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, মাপ করেন বাবু। আমি কিচ্ছু জানি না। ঝর্ণা কই আছে আমি জানি না।

ওসি শিল্পীর ভয়ের অবস্থা দেখে তাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে আবার জানতে চাইলো,

তুমি জানো না, তা আমরা জানি। তোমার কোনো বিপদ হবে না। তুমি ঝর্ণা সম্পর্কে যা জানো নির্ভয়ে বলো। কারো সাথে কি ঝর্ণার বিশেষ পরিচয় ছিল কিংবা কথাবার্তা হতো?

না বাবু, আমি জানি না। আমি যাই। আমারে ছাইড়া দেন।

তা তুমি যেতে পারো। তবে যাওয়ার আগে যদি বলো, কারো সাথে তার বিশেষ জানাশুনা ছিল কি না, তাতে খুব উপকার হবে। তুমি কি চাওনা, তাকে আমরা খুঁজে পাই?

তা তো চাই। অবশ্যই চাই।

তা হলে কিছু জানা থাকলে বলো।

আমি বেশি জানি না। তয়, একটু জানি।

তা-ই বলো।

ওই দিক থেইক্যা এক বুড়ি আইতো। ঝর্ণার লগে কথা কইতো। ঝর্ণারে আদর করতো। একদিন ঝর্ণারে বিস্কুট কিন্যা দিছে। আরেকদিন দাওয়াত দিয়া নিয়া গেছে। হেই কথা একদিন ঝর্ণা আমারে কইলো।

তারপর!

দেখতাম, হেই বুড়ি ঘন ঘন ঝর্ণার কাছে আহে। একদিন দেখলাম, এক জোয়ান বেটা আইছে বুড়ির লগে। আমি জিগাইলে ঝর্ণা আর বেশি কথা কইতো না।

তুমি কি ঝর্ণার কাছে সেই পুরুষটার কথা জানতে চাওনি?

চাইছি। কিন্তুক ঝর্ণা কইতে চাইতো না। কিন্তু পিড়াপিড়ি করার পর কিছু দিন আগে কয়ডা কথা কইল। কিন্তুক কেউরে কইতে বারণ করলো।

কী সে কথা? বলো তো শুনি। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। বলো।

তারে কইয়া দিবেন না তো? কিরা কাইট্যা কন।

হ্যাঁ, কিরা কেটেই বললাম। তাকে বলবো না।

হেই কথা মনে রাখবেন কিন্তুক। ভুইল্যা যাইবেন না। ঝর্ণা আমার সই কি না। তার কথা না রাইখ্যা পারি না।

তার কথা লঙ্ঘন হবে না। বলো।

তা অইলে হুনেন। একদিন তাহের সাহেব মেম সাহেবরে লইয়া বাইরে গেলেন। তখন ঝর্ণা আমার কাছে আইল খুশিতে। বিস্কুট লইয়া আইল। সেই বেটা তারে

বিস্কুট দিছে। কইলো, বুড়ি তারে অনেক আদর করে। হেই বেটা বুড়ির ছেলে। বুড়ি ঝর্ণারে ছেলের বউ কইরা নিতে চায়। এ বইল্যা ঝর্ণা খুব খুশি অইলো। ঝর্ণা আমার মতো চাইলো। আমি কইলাম, তোমার মারে জিগাইয়া লও।

তারপর কী হলো?

ঝর্ণা কইলো, আরো মজা আছে। তাদের সমাজ বড়ই মজার। একজনের লগে বিয়া অইলে অন্যরাও মধ্যে মধ্যে আদর করে, আনন্দ করে। আনন্দই শেষ না। আবার টেহাও দেয়। আমি কিচ্ছু বুঝতাছিনা বিষয়টা কী। আমারে কিরা কাইট্যা কয় আমার কোনো অসুবিধা অইবো না। আমি বুঝি না, কিন্তুক এতটুকু বুঝতাম পারি, আমি যদি টেহা পাই তা আমি মা বাবারে দিতে পারমু। মা-বাবার বড় কষ্টরে শিল্পী! আমার সব দিয়াও যদি মা-বাবারে একটু শান্তি দিতে পারি! হের কথা শেষ না অইতেই তার মেম সাহেবের ডাক আইলো। ঝর্ণা দৌড়াইয়া চইল্যা গেলো।

এরপর ঝর্ণার সাথে তোমার কবে দেখা হয়েছিল?

তারপর আমি আর ঝর্ণার দেখা পাই নাই।

বরযাত্রা

আজ চামেলির বিয়ে।

মেঘনার পারে চরমধ্যা গ্রামে তাদের বাড়ি। বাড়ির চার ভিটায় চারটি ঘর। এরপর একটু জায়গা বাদ দিয়ে পূর্বদিকে বাংলাঘর। বেড়ার বেষ্টনীর ভেতরে নির্মিত চারটি ঘরে ও অন্দরে শুধু মহিলা শুধু অন্দরে বাড়ির পুরুষরাই ঢুকতে পারে। বাড়ির পুরুষদেরও গলায় খাকারি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়, যাতে যাদের সাথে পর্দা আছে তারা সরে যেতে পারে। অন্য পুরুষদের জন্য অন্দর মহলে যাওয়াই নিষেধ। তাদের স্থান হলো বাহির বাড়ি।

বরযাত্রী আসবে সন্ধ্যার পর। অন্দর মহল চামেলির সই, চাচাতো-খালাতো-মামাতো বোন, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের কলকাকলিতে মুখরিত। গায়ে হলুদ হয়ে গেছে আগেই। মেহেদী লাগানো হয়েছে। বিয়ের গ্রামীণ গীতও চলছে নারীকণ্ঠে। বরযাত্রীদের আপ্যায়নের জন্য রান্নাবান্নার ধুমধাম। বান্ধবীরা চামেলিকে মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে রোমান্টিক ইঙ্গিত দিচ্ছে। বরযাত্রীদের বসা ও খাওয়া-দাওয়ার ভালো ব্যবস্থা করা নিয়ে সবাই ব্যস্ত। চর এলাকার মধ্যে এ বাড়ি বড় ঘর। কোনো ত্রুটি হলে সরকার বাড়ির নাম যাবে।

চামেলির দেহমনে রোমান্টিক উষ্ণতার উত্তাপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নামবে। বরযাত্রী আসবে। খাওয়া-দাওয়া শেষে শাহ-নজর হবে। কিন্তু কী লজ্জার কথা! ঘর ভরতি মেয়েদের সামনে বরের দিকে তাকানো কীভাবে সম্ভব? তবে রক্ষা, সরাসরি তাকাতে হবে না। দু'জনের সামনে আয়না ধরা হবে। আয়নার ভেতরের ছবিতে একজনের দিকে আরেকজন তাকাবে। কিন্তু তা-ও কি কম লজ্জার কথা? সবাই তাকিয়ে দেখবে না? কিন্তু এখানেও তো শেষ নয়। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় তাকে পালকীতে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। বর ও কনে কি আলাদা পালকীতে

বসবে, নাকি একই পালকীর দু'দিকে দু'জন বসবে, তাও জানা নেই। যদি একই পালকী হয়, আর বর যদি দুষ্টুমী করে গায়ে হাত দিতে চায়, তখন কেমন হবে! যদি লজ্জায় তার অনিচ্ছায়-ই মুখের আওয়াজ বেরিয়ে যায়, কতো লজ্জার কথা! মানুষ কী মনে করবে? পুরুষদের কি বিশ্বাস আছে? কতো অপেক্ষার পর বউকে কাছে পাবে, সে কি স্পর্শ না করে সুবোধ বালকের মতো বসে থাকতে পারবে? কিংবা এতো গভীরে না গিয়েও যদি চিমটি মারে! তাতে বরং মজা হবে। আকাঙ্ক্ষিত বউকে এতো কাছে পেয়েও কিছুটা দুষ্টুমী যদি না করে, তা হলে তো সে একটু বেরসিকই বটে। কিন্তু সে তো রসিক না হয়ে পারেই না। কলেজ পড়ুয়া ছেলে। তবে ভয় একটাই। যদি একটু স্পর্শ করতে চায়, তা হলে বাধা দিলেই নিজেকে সামলাতে না পেরে সে হয়তো একটু জোর করে বসতে পারে। মনে হয়, হাতের ইশারায় বারণ করলেই বাঁচা যাবে, মুখ বন্ধ রাখতে হবে। আল্লাহ আল্লাহ করে হাত বেশি না বাড়ালেই হয়।

চামেলির এসব কল্পনাগুলো ক্ষণে ক্ষণেই তার মুখে-চোখে রেখাপাত করে যায় তার মনের অজান্তে। অকারণেই ফুটে উঠে লাজুক মুচকি হাসি। যুবতীর মন যুবতী বুঝে। বান্ধবীরাও তার এ কল্পনার রোমাঞ্চে সুরসুরি দেয়। বড্ড পাজি ওরা।

বরযাত্রী আসতে বেশ দেরি হয়ে গেলো। এরপর ছোটদের গেইট ধরা। খাওয়া-দাওয়া। বিয়ে পড়ানোর সময় মোহরের পরিমাণ নিয়ে একটু ভুল বুঝাবুঝিও সৃষ্টি হলো। শেষ পর্যন্ত সমাধান হয়ে গেলো, তবে কিছুটা সময় তো নষ্ট হলোই। বরের চাচা বাচ্চু পরধাইন্যা বিয়ের অনুষ্ঠানসূচি থেকে শাহ-নজরের অংশটা বাদ দিতে চাইলো। কারণ, ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। বিয়ের পর বাড়ি যাওয়ার পথও তো কম নয়। চর এলাকা। কিছুটা যেতে হবে নৌকায়। বাকি প্রায় দেড় কিলোমিটার পায়ে হেঁটে। পথে আবার বালুয়ারচর গ্রাম। সে গ্রামের সাথে চরমধ্যা গ্রামের ঝগড়া চলছে। এ কথাটাও মাথায় রাখতে হবে।

কিন্তু মেয়েদের বিয়ে তো একবারই হয়। এ দিন তো বারবার আসবে না। চামেলি মুখে কিছু বলবে না। তবু মা-চাচীদের দায়িত্ব আছে না! তারা বায়না ধরে বসলো, শাহ-নজর হবেই। একটা অচেনা অজানা ছেলের চেহারাও দেখলো না, আর অমনি তার সাথে চলে যাবে? কীভাবে সে এক সাথে বিছানায় যাবে?

সব আনুষ্ঠানিকতাই হলো। কিন্তু ঘড়ির কাটা তো বসে রইল না। শেষ পর্যন্ত রওনা দিতে দিতে বাজলো দশটা পঁয়ত্রিশ। যাত্রাকালে কান্নাকাটির একটা পর্ব

তো আছেই। বাচ্চু পরধাইন্যা এটাকে সংক্ষেপ করতে পিড়াপিড়ি করলো বারবার। কিন্তু কাজ হলো না। যতোই হোক, চামেলি তো জীবনে একবারই বাপের বাড়ি ছেড়ে যাবে। জীবনে সে কান্নার সুযোগ তো একবারই আসে। তাকে এ থেকে বঞ্চিত করা হবে অবিবেচকের কাজ।

চামেলি জড়িয়ে ধরলো বোনকে। দু'জনে প্রাণ ভরে কাঁদলো। এরপর এলো বান্ধবী। সে যদি কম কেঁদে ছেড়ে দেয় তা হলে লোকেরা বুঝবে, সে তাকে ততো ভালবাসে না। সুতরাং সেও সহজে ছাড়লো না। এরপর এলো একে একে অন্যান্যরা। সব শেষে এলেন মুরব্বিরা। চাচী, বাবা, মা-সবাই। তাদের মনে কষ্ট কি কম! বিয়ে হওয়া মানে মেয়ে অন্যের হয়ে যাওয়া। এরপর সে আর বাপের বাড়ির থাকে না। বেড়াতে আসে বটে, কিন্তু এসেই তাড়া থাকে কখন চলে যাবে। কাজেই মা-বাবা থেকে বিদায় নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। যা হোক, ওদিক থেকে তাড়া থাকায় কান্নার অংশটি সংক্ষিপ্ত হলো। মাত্র চল্লিশ মিনিটেই শেষ হলো।

রাত এগারটা পনেরো। বরযাত্রা ফিরে চললো। কনে পালকীতে। বরও পালকীতে। কিছুক্ষণ যাওয়ার পরই নৌকা। নৌকায় কতক্ষণ যাওয়ার পর হাঁটার পথ। চরের মধ্য দিয়ে পথ। কাছে বাড়ি ঘর নেই। আলো নেই। অন্ধকার। প্রায় আধা কিলোমিটার পথ হেঁটে যাওয়ার পরই বাচ্চু পরধাইন্যা থমকে দাঁড়ালো। তার অভিজ্ঞতা অনেক। চর এলাকার পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে-গ্রামে ঝগড়া লেগেই থাকে। চর দখলের লড়াই তো চলেই। লড়াই না থাকাই ব্যতিক্রম। এ বরযাত্রায় বাচ্চু পরধাইন্যা বয়োজ্যেষ্ঠ। কাজেই তার অভিজ্ঞতা বেশি। সে কিছু একটা বুঝতে পারলো। বললো, তোরা দাঁড়া। আমার কেমন কেমন লাগতাছে। কী একটা আওয়াজ পাইতাছি। ভাবতেছিলাম, বালুয়ারচরের ওরা টের পাইব না। আস্তে আস্তে পার হইয়া যামু। কিন্তু অহনে সন্দেহ লাগতাছে।

চর এলাকার ঝগড়াঝাটি কোনো বড় বিষয়ে হয় না। বরং অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েই বিরাট ঝগড়া হয়। দীর্ঘ দিন যাবৎ লড়াই চলে। মারামারি কাটাকাটি হয়। এমনকি খুন পর্যন্ত হয়।

চরমধ্যা ও বালুয়ারচরের মধ্যে তেমনি একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মারামারি হচ্ছে। বালুয়ার চরের এক কৃষি-শ্রমিক শান্তু মিয়া চরমধ্যার খাঁ বাড়িতে কামলা দেয়। ছয়দিন কাজ করে। কিন্তু মজুরী দেওয়ার সময় তাকে মোট পাওনার চেয়ে পাঁচ টাকা কম দেওয়া হয়। এ নিয়ে তাদের মধ্যে হয় কথা কাটাকাটি। পরে হাতাহাতি। শেষ পর্যন্ত একটু লাঠালাঠি। লাঠির আঘাতে শান্তু মিয়ার মাথা থেকে

কয়েক ফোটা রক্ত ঝরে। তখন শান্ত মিয়া গোষ্ঠীর লোকদের নিয়ে প্রতিশোধের পরিকল্পনা করে। তারা পথে আড়ি পেতে থাকে। কারণ, চরমধ্যার বাসিন্দাদের সড়ক পথে কোথাও যেতে হলে অথবা দূরের রেল স্টেশনে পৌছতে হলে বালুয়ারচরের উপর দিয়েই যেতে হয়।

একদিন তারা সুযোগ পেয়ে গেলো। এক রাতে চরমধ্যার খাঁ বাড়ির কিছু লোক সে পথে যাচ্ছিল। তাদের সাথে সে গ্রামের আরো কিছু লোক ছিল। বালুয়ারচরের লোকেরা তাদের উপর আক্রমণ করলো। এতে খাঁ বাড়ির কয়েকজন আহত হয় এবং বড় বাড়ির একজন পঙ্গু হয়। এভাবে দু'গ্রামের দুই গোষ্ঠীর লড়াই দু'গ্রামের মারামারিতে পরিণত হলো।

কয়েক সপ্তাহ আগেও দু'গ্রামে আবার মারামারি হয়ে যায়, যাতে পুরুষদের পেছন থেকে মেয়েরাও তীর, বর্ষা, টেটা, লাঠি ইত্যাদি যোগান দেয়। মারামারিতে হঠাৎ এক বর্শা গিয়ে লাগে বালুয়ারচরের মোড়ল শামসু ভূঞার যুবতী মেয়ে পিয়ারার গায়ে। সে সাথে সাথেই মারা যায়। এরপর পুলিশ আসে, সালিশ হয়, বৈঠক হয়। মীমাংসাও হয়। কিন্তু ভূঞা বাড়ির মানুষ তা মেনে নেয়নি। বরং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা সুযোগ খুঁজতে থাকে।

বরযাত্রা সেই বালুয়ারচরের কাছাকাছি পথেই এগিয়ে যাচ্ছিল। এখানে এসেই বাচ্চু পরধাইন্যা কিছু সন্দেহ করে থমকে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় আচমকা আওয়াজ এলো, ধর, ধর, ধইরা ফালা, মাইরা ফালা।

আর শুরু হয়ে গেলো হৈ-চৈ ও হুলুস্থুল কাণ্ড। তাদের মূল লক্ষ্য পালকী। তারা পালকী থেকে নয়া বউকে টেনে হেঁচড়ে নামালো। আট-দশজন যুবককে শামসু ভূঞা কড়া নির্দেশ দিলো,

বউডারে লইয়া হেই চরে চইল্যা যা।

গিয়াসুদ্দিন দৌড়ে গিয়ে শামসু ভূঞার পায়ে পড়লো। শামসু ভূঞা এক হুংকারে বলে উঠলো,

আমার পিয়ারারে ফেরত দেও, তারপর বউরে লইয়া যাইও!

ফষ্টি-নষ্টি

একটা পিড়ি টেনে শাহার মা উঠানে বস্‌লো।

তার চোখে মুখে আনন্দের আমেজ। এবার ফলন হয়েছে ভালো। ধান দিয়ে দু'টা জাবাড় ভরেছে। উঠানে আজ যে ধান আছে, তা দিয়ে তৃতীয় জাবাড়টাও টায় টায় ভরে যাবে। উঠানের কোনে পেঁপে গাছে ধরেছে প্রচুর পেঁপে। একটা বড় পেঁপে লালচে হয়ে উঠেছে। দু'একদিন পরই খাওয়া যাবে। পেঁপের জাতটা অনেক ভাল। পাকলে বেশ মিষ্টি। এদিকে পুকুরও মাছে বোঝাই। তাজা মাছের স্বাদ কি বাজার থেকে কেনা মাছে পাওয়া যায়? গাভীটা প্রায় পাঁচ কেজি দুধ দেয়। মাচা ভর্তি লাউ কুমড়া তো আছেই। শান্তির জন্য আর কি চাই? কিন্তু শাহার বাপের মাথায় যে এক ভূত চেপেছে। সে শাহাকে স্কুলে পাঠাতে চায়, যেনো লেখাপড়া করে সে বড় সাহেব হয়। এর দরকারটা কী? তারা কি অভাবে আছে? অশান্তিতে আছে? সন্তানদের নিয়ে নিজ গাঁয়ে থাকবে আনন্দে, এটাই তো ভালো। সাহেব বানিয়ে শাহাকে শহরে ফেলে রেখে লাভটা কী? এসব ভাবতে ভাবতে পিড়িতে বসে মুখে পান চিবুতে চিবুতে শাহার মা বললো,

হুনেন গো শাহার বাপ! আমার কথাডা একটু ভালাভাবে ভাইব্যা দেহেন। আমি কইছিলাম কী, শাহা গিরস্তির কামেই থাক। লেহাপড়া কইরা শহরে গিয়া কী অইবো? আমাগো কি কিছু কমতি আছে?

তা অনেকটা ঠিক কতাই কইছো। কিন্তু একটা কতা ভাব্যা দেহো। আমগোর সব আছে, কিন্তু লেহাপড়া নাই। মানুষ আমাগো মূর্খ কয়। এর লাগ্যাই শাহারে লেহাপড়ায় দিতে চাই।

কতাডা ঠিক। কিন্তু, দেহেন, আজ কাইল লেহাপড়া কইরা অনেক মানুষ নষ্ট অইয়া যায়। ওই যে নামাপাড়ার রমযান পরধাইন্যার পুলা লেহাপড়া কইরা বউ লইয়া শহরে থাহে। আপনি দেখছেন, তারা কেমন বেহায়াভাবে চলে?

ঠিক কইছো। কিন্তু লেহাপড়া তো মানুষরে মানুষ বানাইবার কতা। এইডা এমন খারাপ হইল কেমনে? লেহাপড়াটারে কি ঘষ্যা-মাজ্যা ঠিক করা যায় না?

এইডাই শেষ না, শুধু বেহায়া কাপড়-চোপড় না। আরো হুনছি, শহরে মাইয়ারা পুলারা নষ্টামীও করে। ছি ছি ছি। লাজ-শরম নাই।

এভাবে শাহার মা ও বাপ অনেক আলাপ-আলোচনাই করলো। লেখাপড়ার গুণ আছে, আবার দোষও আছে। অবশেষে ঠিক হলো, একটু ঝুঁকি নিতে হলেও তাদের দু'ছেলের মধ্যে শাহাকে তারা লেখাপড়া করাবে। গাঁয়ে তাদের সয়-সম্পত্তি আছে অনেক। বাড়িতে যদি একজন লেখাপড়া জানা সাহেব থাকে, তবে তারা হবে গাঁয়ের সেরা।

শেষ পর্যন্ত তারা শাহাকে লেখাপড়া করতে দিল। লেখাপড়ার খরচ চালাতে তাদের কষ্ট হয়নি। শাহাও ভালভাবেই পাশ করলো। আর পাশ করার সাথে সাথেই চাকুরিও হয়ে গেলো। শাহার মা ও বাবা বেজায় খুশি।

আজ সকাল থেকেই শাহার মা'র মনে যেনো এক কৌতূহলী আনন্দের শিহরণ লাগলো। তার চোখে মুখে আনন্দ রেখা ফুটে উঠেছে। শাহার বাপ নামায পড়তে গেছে মসজিদে, আর শাহার মা পিড়ি টেনে বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছে। যখন শাহার বাপ ফিরলো, তখন তাকে ইশারায় কাছে ডেকে বললো,

বহেন, কতা আছে।

মাথা থেকে টুপিটা খুলতে খুলতে শাহার বাপ বললো,

আবার কী কতা, কও হুনি!

শাহা সাহেব অইছে, চাকরিও অইছে। অহন ঘরে একটা বৌ দরকার না? শিক্ষিত পুলার শিক্ষিত বৌ আইবো, আপনারে আব্বা কইবো, আর আমারে আম্মা কইবো। বলেই আনন্দ যেনো আর ধরে রাখতে পারে না।

ঠিকই কইছ, পুলার মা। আমিও মনে মনে তা-ই ভাবতাছি। হেই গেরামের মুন্সী বাড়ির একটা ভালো মাইয়া আছে। অলী পরধান্যা বিয়ার প্রস্তাবও দিছে।

তা হলে! পুলারে খবর দিয়া বিয়া ঠিক করেন। দেরি কইরা কী লাভ?

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক ভেসে এলো,

শাহার বাপ বাড়ি আছেন? আমি ডাক পিয়ন। আপনার চিঠি আছে।

চিঠির কথা শুনেই শাহার বাপ দৌড়ে গেলো। বেশ কিছু দিন যাবৎ ছেলের চিঠি পাচ্ছে না, তাই এতো উৎসাহ। দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

কার চিঠি আইছে?

আপনার ছেলের চিঠি।

তাইলে একটু পইড়া দেন না। আমি যে পড়তে পারি না।

শাহার বাপ পিয়নকে নিয়ে বাংলা ঘরে বসলো। চিঠির খাম খুলতেই ফাঁক দিয়ে একটা ছবি নিচে পড়ে গেলো। শাহার বাপ তাকিয়ে দেখলো, সংক্ষিপ্ত পোশাকের এক যুবতী মেয়ের ছবি। ছবিটা দেখে তার মন ছেৎ করে উঠলো। তবু চুপ করে সে চিঠি শুনলো। কুশলাদির পর শাহা বলেছে, সে এই ছবির মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায়। সে চিঠি ও ছবি নিয়ে শাহার মা'র কাছে গেলো এবং ধপ করে পিড়িতে বসে পড়লো।

নেও, তোমার পুলার চিঠি। এ মাইয়ারে বিয়া করতে চায়।

মাইয়াটা কেমন যেনো বেহায়া বেহায়া লাগতাছে?

শুধু বেহায়া না, ফষ্টি-নষ্টির মাইয়া মনে হইতাছে। হুন্যা নেও, এ বিয়াতে আমার মত নাই।

বিলাপের কণ্ঠে শাহার মা বলতে লাগলো,

হায়রে কপাল! হুনছি, শহইরা খারাপ মাইয়ারা ফষ্টি-নষ্টি কইরা ভালা পুলাগর পটায়। আমগর এ ভালা পুলাডারে পটাইয়া লইলো?

এবার শাহার বাপ যেতে যেতে হুংকার দিয়া বলে উঠল,

হুন্যা রাহো। পুলা যদি ওই মাইয়ারে বিয়া করে, তাইলে আমি তারে ত্যাজ্য পুত্র কইরা দিমু। আমি কারো কথা হুনতে চাই না। এ কতা হুন্যা রাহো।

স্বভাবতই ছেলের অনুকূলে মার কোমলতায় শাহার মা বলে উঠল,

অমন কতা কইবেন না। হায়রে আমার পুলা! আমি অহন কী করি?

কয়দিন পর শাহা নিজে দু'একজন বন্ধুসহ গাঁয়ের বাড়ি এলো। বাপ-মাকে বুঝাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তারা কিছুতেই তাদেরকে রাজি করাতে পারলো না। তার মা দোহাই দিয়ে বুঝালো। কিন্তু শাহা নাছোড়বান্দা। সে মেয়েটাকে বিয়ে করবেই। শেষ পর্যন্ত শাহা ও তার বন্ধুরা ফিরে যায়।

অতঃপর যা হওয়ার তাই হলো। বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়েতে শাহার বাপ-মা বা অন্য কোনো আত্মীয় উপস্থিত হয়নি। শুধু বন্ধুবান্ধব নিয়েই বিয়ে হয়। এ খবর পেয়ে শাহার মা হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেললো। যতোই হোক শাহা তো পেটের ছেলে। সন্তান যতো খারাপ বা অবাধ্যই হোক, মা তাকে ছাড়তে পারে না। শাহার মা স্বামীকে কেঁদে কেঁদে বুঝালো, বিয়েটাকে মেনে নেওয়ার জন্য। কিন্তু শাহার বাপ কোনোমতেই রাজি না। শেষ পর্যন্ত শাহার বাপ শাহার নিকট ত্যাজ্যপুত্র করার চিঠি পাঠিয়ে দিলো।

দিন যায় বছর যায়। ছেলের সাথে বাপ মা'র সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। এভাবে সাতটি বছর কেটে গেলো। শাহার মা'র অবস্থা পাগলের মতো। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। শরীরে হাড্ডি ছাড়া আর কিছু নেই। অসুখ বিসুখ লেগেই থাকে।

এক বিকেলে শাহার মা পিড়ি টেনে উঠানে বসে স্বামীকে বললো,

হ্যাগো, আমি তো মরণের পথে আছি। সময় শেষ। মইরা যামু। আমি কি পুলারে এক নজর দেইখ্যা মরতে পারমু না?

দীর্ঘদিনের বিরতিতে পিতৃ হৃদয় যেনো চৌচির। চাপা নিঃশ্বাসে সে বললো, বেরিয়ে এলো,

এতো আশা কইরা পুলারে লেহাপড়া করাইলাম! শেষ পর্যন্ত এই ছিল কপালে?

'যেইডাই হউক, আমি পুলারে দেখ্যা মরতে চাই'। শাহার মা'র শেষ আকুতি।

তোমারে কেমনে বুঝামু? আল্লাহর কাছে কী জবাব দিমু? নষ্ট মাইয়্যার সাথে ফষ্টি-নষ্টি কইরা বিয়া করলে পুলাপানও নষ্ট অইব। আমাগো সব শেষ অইব। হুনছি, পুলার ঘরে এক মাইয়া অইছে। শহরে হওয়া পুলা-মাইয়ার আসল বাপ কে, আসল মা কে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে?

ঠিকঅই কইছেন। তবু কী করমু? পেটে তো বাচ্চা নিছি আমি। আপনার পায়ে ধরি, একবার পুলারে আইতে দেন। নাইলে আমরাই যাই। পুলাডারে এক নজর দেখ্যা আহি। এরপর আর কিছু কইমুনা।

কী যে করি! এইডাই ছিল আমার কপাল!

সেদিনের কথা এখানেই শেষ হলো। শাহার মা বুঝতে পারলো, তার স্বামী একটু নমনীয় হয়েছে। শাহার মা একজনের মাধ্যমে শাহার নিকট খবর পাঠালো, সে যেনো বাড়ি আসে। আর বাবার নিকট ক্ষমা চায়, এবং বাবাকে অনুনয়-বিনয় করে শহরে বেড়াতে নিয়ে যায়।

শাহা তার মা'র পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলো। সে এসে বাবা মা'র নিকট ক্ষমা চাইলো এবং কাকুতি-মিনতি করে তাদেরকে শহরের বাসায় বেড়াতে যেতে অনুরোধ করলো। শেষ পর্যন্ত তারা যেতে রাজি হলো। কিন্তু রাত্রে শুয়ে শাহার বাপ তার স্ত্রীকে বললো,

পুলার বাসায় যাইতে রাজি হইছি ঠিক, কিন্তু কোনো ফষ্টি-নষ্টির আলামত দেখতে চাই না। এ কথা মনে রাইখো।

শাহা তো মহা খুশি। শেষ পর্যন্ত তার বাবা-মা তার বিয়েকে মেনে নিয়েছে। এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই। সে রাতেই মোবাইল ফোনে ঢাকায় তার স্ত্রীকে একথা জানিয়ে দিলো। বলে দিলো, যেনো বাসায় খাবার-দাবারের ভালো আয়োজন করা হয়, তার স্ত্রী ও মেয়ে ম্যারী যেনো ভালো পোশাক পরে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত থাকে। ম্যারীর মামাও যেনো স্বাগত জানাতে উপস্থিত থাকে।

সকালে উঠেই শাহা তার বাবা-মাকে নিয়ে রওনা হলো। ঢাকা পৌছতে বিকাল চারটে বেজে গেলো। শাহা কাছাকাছি এসেই ফোন করে স্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছে। কাজেই ম্যারী, তার মা ও মামা স্বাগত জানাবার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। তাদের মনে পরম আনন্দ ও চরম উত্তেজনা।

অবশেষে সে মাহেন্দ্রক্ষণ এলো। তারা বাসার আঙ্গিনায় পৌছলো। শাহা পরিচয় করে দিলো: মেয়ে ম্যারী, মেয়ের মা মীরা, আর মেয়ের মামা শামিম সাহেব। ম্যারী খুশিতে মাকে জড়িয়ে ধরলো আর বললো,

মামী, মামী, দাদা-দাদী এসেছেন। একথা শুনেই শাহার বাপ ভীষণ রাগে বললো,

কী? কী কইলা তুমি? উনি তোমার মামী? অর্থাৎ কি না তোমার মামার বউ?

আবার ম্যারীর মামার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো,

শরম-টরম নাই তোমার? তোমার বউ আমার পুলার কাছে দিয়া রাখছো ফষ্টি-নষ্টি করার লাইগ্যা?

এবার শাহার দিকে ফিরে তার বাবা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললো,

পুলা? এইডাই তোমার কাণ্ড? এইডা দেহার লাগ্যাই আমাগো নিয়া আইছো? ফষ্টি-নষ্টি মাইয়ারে বিয়া করছো! আবার শালার বউরে নিয়া রাত কাটাইছো! ছি ছি ছি!

এরপর শাহার বাপ স্ত্রীর দিকে ফিরে বললো,

চলো ফিরা যাই। এ বেহায়া বেশরম ফষ্টি-নষ্টির মাইঝে এক মিনিটও থাকতে চাই না।

এ বলে স্ত্রীর হাত টেনে ধরে শাহার বাপ ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। শাহা, ম্যারী, ম্যারীর মা ও মামা তাদেরকে কাকুতি-মিনতি করে বুঝাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তারা কোনো কথাই শুনতে রাজি হলো না।

অবশেষে স্ত্রীর হাত হেচকা টেনে নিয়ে শাহার বাপ ফিরে চললো গাঁয়ের দিকে।

বউ

এক

দুপুর গড়িয়ে বিকেল পড়েছে। না খেয়ে সে রাত কাটিয়ে দিয়েছে। নাস্তা খাওয়ার জন্য বারবার ডাকা সত্ত্বেও সে দরজা খোলেনি। দুপুরেও বের হয়নি, খায়নি কিছুই। ডাকাডাকি হচ্ছে অনেক, কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না মোটেই।

ঝর্ণার জন্য বাড়ির সবাই চিন্তিত। তার বাবা সকালে অফিসে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওর মা'র ফোন পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন। ঝর্ণার মনের অবস্থা বুঝতে তাদের মোটেই অসুবিধা হয় না। তিন তিনটি মাস যাবত ওর বরের কোনো খবর নেই। সকালে সে কাজে গিয়েছিল, কিন্তু বিকেলে ফেরেনি। সে রাজনীতি করে না, কাজেই প্রতিপক্ষ দ্বারা গুম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আশেপাশের সব থানায় খবর নেওয়া হয়েছে, হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতেও যোগযোগ করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কোনো রিপোর্ট নেই। কাজেই শহীদ কী কারণে এতদিন বাড়ি ফিরলো না, তার কোনো ক্লু কেউ খুঁজে বের করতে পারছে না।

তবে ঝর্ণা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে। কিন্তু সে ভাবতে পারে না, স্কুল মাস্টারের এ ছেলের এমন স্পর্ধা। সামান্য একটু কানমলার কারণে সে এমন বেয়াদবীর আচরণ করবে! আর কানমলাটাও বিনা কারণে নয়। ঝর্ণা তাকে স্পষ্ট করে বলেছিল, ঠিক সাড়ে পাঁচটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। সে কিনা ফিরলো ছয়টায়, আধা ঘণ্টা দেরি করে। সে কানমলা পাবে, না কি আদর পাবে? এরপর থেকে সারারাত সে রইলো মুখ কালো করে। সকালে গেলো অফিসে। বিকেলে আর ফিরলো না। দীর্ঘ তিন মাস পার হয়ে গেলো। একটা ফোনও করলো না। ঝর্ণা বান্ধবীদের মুখ দেখাতে পারছে না। বিয়ের এক বছরের মাথায়ই স্বামী হারা। বান্ধবীদের সান্ত্বনা বিষের মতো লাগে তার। যেসব বান্ধবীদের বাবাদের গাড়ি নেই বাড়ি নেই, তারা ঝর্ণার মতো বড় লোকের মেয়ের প্রতি করুণা

দেখায়। এটা কি সহ্য করা যায়? কাজেই গত কয়েকদিন যাবত তার মন খুবই খারাপ। সব সময় চাপা একটা অস্থিরতা। তবে স্বামী আর তার ফিরে আসার স্বপ্ন এখনো তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে অন্তত অপেক্ষার ভেতর।

বিকেল তিনটা। ডাকপিয়ন এক চিঠি নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে। বিদেশি চিঠি। কানাডা থেকে ঝর্ণার বান্ধবী আফিফা এ চিঠি লিখেছে। ঝর্ণা কারো ডাকে দরজা খুলেনি, কিন্তু এ চিঠির কথা শুনেই দরজা খুললো, আর চিঠিটা হাতে নিয়ে আবার দরজা লাগিয়ে দিলো। এরপর এক ঝাপে বিছানায় দেহ এলিয়ে দিয়ে পড়তে লাগলো।

ঝর্ণা,

আশা করি ভালো আছিস। লিখি লিখি করে কয়েক মাস হয়ে গেলো। নতুন দেশে এসে ঘর গোছানো বড়ই ঝক্কির কাজ। দু'জনে মিলে কাজ কিছুটা গুছিয়েই লিখতে বসলাম।

সই, তোর জীবন সুন্দর হোক, এটাই আমার কামনা। এ কামনাকে সামনে রেখেই তোকে কিছু কথা বলবো বলে অনেকবার ভেবেছি। কিন্তু মুখ খুলে সামনা-সামনি বলতে পারিনি। আজ চোখের আড়ালে থেকে দু'একটা কথা বলার ইচ্ছা করছে। একটু ভেবে দেখিস। তোর বাবা অনেক ধনী। তোর জন্য তিনি সুপুরুষ ও হ্যান্ডসাম বর জোগাড় করেছেন, যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএসে প্রথম স্থান অধিকারী। নিজ গুণেও সে পরম সম্মানের পাত্র। সে একজন মাস্টারের ছেলে, এটি তার দোষ নয়। মনে রাখিস, পুরুষের আত্মমর্যাদাবোধ থাকে। একটা মেয়ে যেমন সম্মান পাওয়ার যোগ্য, শহীদের মতো একটা সু-পুরুষেরও সম্মান প্রাপ্য। যেখানে এর অভাব থাকবে, সেখানে একটা সুখের নীড় গড়ে উঠতে পারে না। বাপের বাড়ির ধনাঢ্যতার অহমিকা এ বন্ধনকে দুর্বল করে দিতে পারে, এমন কি ভেঙ্গেও দিতে পারে। আমি কী বলতে চাইছি, তা তোর বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা না। ভুল হলে ক্ষমা করে দিস। তোদের জীবন সুখী হোক, এটাই আমার কাম্য।

আফিফা

চিঠি পড়া শেষ হলো। যে উপলব্ধি তাকে কদিন ধরে ভীষণ পীড়া দিচ্ছিল, তাতে আরো ঝড় উঠলো, যেনো সমুদ্রের ঢেউ তার মনকে তোলপাড় করে দিলো। সে উথাল-পাতাল ঢেউয়ে হারিয়ে গেলো তার মন। অতঃপর যখন সে তার মনকে ফিরে পেলো, সে অনুভব করলো, তার চোখের দু'কোণে শিশির বিন্দুর মতো জলকণা জমে এসেছে। সে উঠে বসলো। মনে মনে কিছু একটা ভেবেই সিদ্ধান্ত নিলো। সে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে দরজা খুলে নিঃসঙ্কোচে বললো,

মা আমাকে ভাত দাও।

ম'ার কাছে ঝর্ণার স্বাভাবিক আচরণ কেমন যেনো অস্বাভাবিক মনে হল।

কিরে, তোর কী হয়েছে? আয় সোনামনি, দুইদিন না খেয়ে চেহারাটা কী হয়েছে! আয়, মুখে একটু ভাত দে। অনেকদিন পর মায়ের হাতের রান্নার স্বাদ অনন্য মনে হলো তার। পেট পুরে খেল সে।

ভাত খেয়ে ঝর্ণা আবার তার ঘরে ঢুকলো। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে লিখতে লাগলো।

আফিফা,

তুই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছিস। তুই বলেছিস, ভুল হলে ক্ষমা করে দিস। আমি তোকে ক্ষমা করবো না। অন্য বান্ধবীদেরও ক্ষমা করবো না। তোরা আগে কেন আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিলি না। আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আজ তিন মাস হয়। আমি তাকে কোথায় পাবো? আজ আমি আমার সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তোরা সবাই আমার স্বামীকে খুঁজে দে। আমি এবার সুখের সংসার গড়বো। তবেই তোরা ক্ষমা পাবি।

ঝর্ণা

দুই

নিউইয়র্কে বাঙালি সমাজের ঈদ পুনর্মিলনী। মাঝে মাঝেই এখানে এমন সমাবেশ হয়। সবার দেখা সাক্ষাৎ হয়। কাজেই তারা একে অপরকে চেনে। তাহেরা আজ সেখানে একটা নতুন মুখ দেখে বিস্মিত হলো। তার বিস্ময় কোনো নতুন মুখ

দেখার কারণে নয়, বরং এজন্য যে তাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু সে তাকে ঠিক চিনতে পারছে না। সুশ্রী, সুপুরুষ, পরম আকর্ষণীয় সে লোকটি। কোথাও দেখা হয়েছে। তবে মনে পড়ছে না কোথায়।

ঈদ পার্টির গোটা সময় ধরেই তাহেরা তাকে ফিরে ফিরে দেখেছে। তার প্রতি তার এমন কৌতুহল দেখে কেউ কোনো প্রকার সন্দেহ করে কি না, এ চিন্তায় সে তার প্রতি সরাসরি না তাকিয়ে বরং ঘুরে ঘুরে আড় নজরে লক্ষ্য করছে। অনেক ভাবনা চিন্তার পর স্মৃতির খাতা চেক করে হঠাৎ তার মনে হলো, লোকটি কি তার বান্ধবী ঝর্ণার বর! এক বছর পূর্বে ঝর্ণার বিয়ে হয়। সে ঢাকায় তার বিয়েতে গিয়েছিল। কেবল তখনি ঝর্ণার বরকে দেখা। সেই এক দেখাতে যতটুকু মনে রাখতে পেরেছে, সে মতে লোকটাকে ঝর্ণার বরের মতোই মনে হচ্ছে। কিন্তু সে এখানে কেথেকে আসবে? তার বর এখানে এলে ঝর্ণা নিশ্চয়ই খবর দিতো।

আর কালই তো তাহেরা তার ফটো অ্যালবাম গুছাতে গিয়ে ঝর্ণার বিয়ের ছবিগুলো হাতিয়ে দেখছিল। তার বরের ছবি এ ব্যক্তির সাথে হুবহু মিলে যায়। কিন্তু তা হলে ঝর্ণা কোথায়? তার বর কি এখানে বেড়াতে এসেছে? কিন্তু সে তো নিউইয়র্ক বেড়াতে আসার মতো স্বচ্ছল ছিল না। তবে কি ঝর্ণা বা তার বাবার আনুকুল্যে সে বেড়াতে এসেছে? কিন্তু তা হলে ঝর্ণাকে ছাড়া আসবে কেন? নাকি সে ডাক্তারী চাকরি নিয়ে এসেছে? কিন্তু তা হলেও ঝর্ণাকে ছেড়ে একা কেন আসবে?

তাহেরা হিসেব মেলাতে পারছে না। অতঃপর সে একটা কোকের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে অনেকটা অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়ে লোকটির কাছে যাওয়া শুরু করলো এবং ভাবতে লাগল কীভাবে আলাপ শুরু করা যায়। মাথায় আরো অনেকগুলো অপশন থাকলেও মুসলমান বাঙালির সালাম প্রথাই তার কাছে শ্রেষ্ঠ মনে হলো।

আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনি কি নিউইয়র্ক নতুন এসেছেন?

জ্বি, হ্যাঁ।

আপনি একা? সাথে কেউ নেই?

নেই।

নেই মানে? এখনো বিয়ে করেননি বুঝি?

কিছুটা ইতস্তত করে তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে গিয়ে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

হ্যাঁ বিয়ে করেছি। না, না, আমি বিয়ে করিনি।

তাহেরা লক্ষ করলো, শহীদের চোখে মুখে ভেসে উঠেছে গভীর বেদনার লিখন। তা পড়তে তার কোনো অসুবিধে হলো না। এরপর আরো কিছু কথা হলো তাদের মধ্যে। শহীদ নিউইয়র্কের এক ক্লিনিকে চাকুরি নিয়ে এসেছে।

কানাডার আফিফা ও তাহেরার মধ্যে ঘন ঘন কথাবার্তা হয় টেলিফোনে। সেইদিন ঈদের পার্টি শেষ হওয়ার পর বাসায় গিয়েই আফিফাকে ফোন করলো তাহেরা। আফিফা তাকে ঝর্ণার সাথে তার পত্রালাপের কথাও বললো। একথাও জানালো যে, ঝর্ণা তার স্বামীকে ফিরে পেতে বান্ধবীদের দায়িত্ব পালনের কথাও স্মরণ করে দিয়েছে।

তিন

ক'দিন যাবত ঝর্ণা অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে। ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া নেই। ঘুম নেই। এদিক থেকে ছুটে যায় ওদিক। ওদিক থেকে আসে এদিক। বিড়বিড় করে বলতে থাকে, বউ হতে চাই। আজ সকালে ঝর্ণা তার বান্ধবী আফিফার ফোন পেলো। দুপুরের পূর্বে তাহেরার কলও পেলো। এরপর সে সত্যি পাগলের মতো হয়ে গেলো।

সে তার মা'র নিকট গিয়ে বললো: মা, আব্বুকে বলো, টিকেট নিয়ে আসতে। আমি নিউইয়র্ক যাবো। আমি বউ হতে চাই। আমি শুধু বাবার মেয়ে হয়ে থাকতে চাই না।

মা তার আচরণের কোনো কিছুই ধরতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন,

কী পাগলামী কথা বলছিস! বাবাকে অস্বীকার করবি? তুই বাবার মেয়ে না?

ঝর্ণা আগের মতোই ঘোরের সাথে বলতে লাগল,

হ্যাঁ মা। তবে আমি শুধু বাবার মেয়ে হয়ে থাকতে চাই না। আমি আমার পরিচয়ে একটা মেয়ে হতে চাই। স্বামীর পরিচয়ে বউ হতে চাই।

মেয়ের এমন আবোল-তাবোল কথা শুনে ঝর্ণার মা স্বামীকে ফোন করলেন। তার বাবা সব কাজ বাদ দিয়ে দৌড়ে ফিরলেন বাসায়। ঝর্ণা এক দৌড়ে বাবার নিকট গিয়ে বললো, বাবা, নিউইয়র্কের টিকেট এনেছো?

মেয়ের অস্থিরতা আঁচ করতে পেরে বাবা যথেষ্ট স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে করতে বললেন,

নিউইয়র্কে কী আছে? কোথায় যাবে? কী ব্যাপার?

ঝর্ণা এখনও ঘোর লাগা পাগলের মতো করে বলতে লাগল, ব্যাপার-ট্যাপার তোমার জানার কিছু নেই। তুমি আমায় নিয়ে যাবে কি না বলো! নইলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

অগত্যা কী আর করা। ঝর্ণাকে নিয়ে মা-বাবা উঠলো নিউইয়র্কের ফ্লাইটে। তাহেরা তাদেরকে নিতে এলো এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্ট থেকে চল্লিশ মিনিট ড্রাইভের পর এক বাসার দুয়ারে এসে গাড়ি থামলো। তাহেরা নক করলো দরজায়। কিন্তু দরজা খুলছে না। আসলে এতো রাতে এ দরজায় ইতোপূর্বে কেউ নক করেনি। অনেকবার নক করার পর ঠক করে দরজা খুললো। শহীদকে দেখে ঝর্ণা দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বললো, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। একবার বলো, ঝর্ণা আমার বউ।

অকস্মাৎ বউয়ের এ আগমনে শহীদের মনের আকাশে অভিমানের মেঘ ভেসে গিয়ে আনন্দের জোছনা ছড়িয়ে গেলো। সে ঝর্ণাকে দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে নিয়ে অস্ফুটস্বরে বললো,

ঝর্ণা, তুমি আমার বউ হবে?

পীরপুর দরগাহ

নাচের তালে তাদের মাথায় ঝাকড়া জটবাঁধা চুলগুলো উঁচু-নিচু আছাড় খেয়ে পড়ছে। বাতাসে ভেসে যাওয়া শাড়ির আঁচলের মতো মাথার ঝাকড়া চুল বেয়াড়াভাবে উড়ে যাচ্ছে কখনো ডানে, কখনো বাঁয়ে।

মহিলাদের গোটা দেহে উপচে পড়ছে নাচন। নাচছে শাড়ি, নাচছে আঁচল। নাচের তালে কখনো পিছলে পড়ছে গায়ের শাড়ি। আর তা না-দেখা না-বুঝার ভঙ্গিতে অবিরাম দেহ দুলিয়ে নেচেই যাচ্ছে পীর-ভক্তিতে পাগলপারা নারী ভক্তরা। তাদের চেয়ে আরো বেশি চঞ্চল তাদের বুকের নাচন। মাঝে মাঝে ধুয়ার কুণ্ডলীর মতো উপরে মন্থরভাবে উড়ে যাচ্ছে গাঁজার আমেজ। চারদিকে গুঞ্জরিত আওয়াজ হচ্ছে,

পীর বাবা, পীর বাবা, পীর বাবা ফতেহ্ শাহ্!

পীর বাবা ফতেহ শাহ্‌র মাজারের চারদিকে বসেছে ভক্তদের আসর। চলছে গাজার নেশায় আসক্ত দোদুল্যমান ভক্তদের এমনি উন্মত্ত নাচানাচি। অন্যান্য মাজারের পীরদের চেয়ে এ পীরের মরতবা যেমন বেশি, তেমনি তাঁর মাজারের প্রকৃতি ও আকারও ভিন্ন ধরনের। মাজারটির দিকে তাকালে মনে হয় যেনো ভরা যৌবনের কোনো যুবতী তার উন্মুক্ত বুক নিয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছে। মাথা উঁচু করে আছে উন্মুক্ত বক্ষের খাড়া পিরামিড। দক্ষিণ দিকে হাতির শূড়ের মতো চলে গেছে প্রায় পাঁচ মিটারের মতো। উন্নত বক্ষের এ পিরামিড থেকে দুধ বেরোয় না, বরং গোদুগ্ধ দ্বারা এটাকে ধৌত করা হয় প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার। এ দু'দিন হলো দরগায় ভক্তদের আসর দিবস।

পীরপুর দরগাহটি যে অতিপ্রাকৃতিক একটা কিছু, তা মানুষ সহজেই উপলব্ধি করে। চারপাশে পানি আর পানি, মাঝখানে একটু টিলা, টিলার উপর মাজার।

মাজারের দক্ষিণে গভীর জলের দরগার বিল, উত্তরে গভীর ধুলসমুদ্দুর বিল। পূর্ব ও পশ্চিমে ঝিল থাকলেও তা এতো গভীর নয়। শুষ্ক মওসুমে শুকিয়ে যায়।

মাজারটির পাশেই মেঘের মতো ছায়া দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল কালোত্তীর্ণ বটগাছ। স্বচ্ছ পানিতে এর পাতার ছায়া কুলার মতো দেখায়, যাতে সাতার কাটছে ছোট বড় মাছ। এ সন্তরণে সৃষ্ট পানির কম্পন ছড়িয়ে দিচ্ছে মৃদু সঙ্গীতের ঝংকার। মাজারে আকুতি জানাতে আসা মাছগুলোকে কেউ কিছু বলে না, তাই তো এখানে তাদের দলে দলে এমন নির্ভয় বিচরণ। গোটা মাজারটিতে সুগন্ধি ছড়ায় রজনীগন্ধা। শীতল ছায়া বিছিয়ে দেয় জলপাই গাছ, বিস্তৃত বটবৃক্ষ, আরো কতো গাছ পালা।

এ দৈব ঐশী মনোরম পরিবেশের পবিত্র স্থানটিতে চলছে এখন উন্মত্ত নৃত্য। নাচের তালে তালে, নারী-পুরুষের দৈহিক ঘর্ষণে ঘর্ষণে, গাজার আমেজে সবাই যেনো মারেফতের উচ্চ আসনে পৌছে গিয়ে পীর বাবার দর্শন পেয়ে গেছে। এমন এক তন্ময় আমেজে বাঁধ সাধলো পীরপুরের মাওলানা ফজলুর রহমান। তিনি এলেন এবং চিৎকার দিয়ে বললেন, তোমাদের কী হলো, তোমরা মাতালের মতো নাচানাচি করছো কেন? মহিলা-পুরুষ ঢলাঢলি করছো? এসব নাজায়েয! হারাম!

এতে গাজার আধ্যাত্মিক আমেজের উন্মত্ত নাচনে একটু ধাক্কা লাগলো বটে, কিন্তু মাথায় জট পাকানো ভক্তরা রক্ত চোখের চাহনীতে তা উড়িতে দিতে চেষ্টা করলো। দরগাহর খাদেম দৃঢ় হুংকারে বললো,

কী বললেন? নাচ হারাম? কে বললো তা হারাম? আল্লাহই তো নাচতে হুকুম দিছেন।

মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব এবার আরো রেগে গিয়ে বললেন, সব ভণ্ডের দল! কোথায় আল্লাহ নাচতে বলেছেন?

খাদেম সাহেব এবার তাচ্ছিল্যের সাথে বললো,

কেন, আপনে মৌলভী হইছেন, আপনে জানেন না? কুরআনে নাচের হুকুম দেওয়া হইছে বহুবার। আপনি না জানলে সূরাটি হুনেন,

কুল্ আ'উযু বিরাব্বিন্ নাচ্।

মালিকিন্ নাচ্।

ইলাহিন্ নাচ্ ।

দেখলেন মৌলভী? নাচবার অর্ডার বার বার দেওয়া হইছে । আপনেও আসেন । নাচেন ।

এবার মাওলানা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন,

সব মূর্খের হাড্ডি! এটা 'নাচ' নয়, এটা 'নাছ' । 'নাছ' মানে মানুষ । এ সূরায় মানুষ ও জিন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । নাচের কথা নয় । মেয়ে-পুরুষের এরূপ ঢলাঢলির নাচ নাজায়েয ।

দরগাহ্র খাদেম আবার যুক্তি দিতে চেষ্টা করলো,

আরে, আপনি তো মোল্লা মানুষ, শরীয়ত নিয়া আছেন, মারেফত কী বুঝবেন? কুরআনের বাহ্যিক অর্থের অভ্যন্তরে মারেফতি অর্থ আছে । তা আপনারা বুঝবেন না । গাঁজা ধরেন, নাচে যোগ দেন, তখন মারেফত বুঝবেন ।

এমন সময় এক জীর্ণ শীর্ণ মহিলা এক আধমরা শিশু কোলে নিয়ে দৌড়ে এলো । কাঁদতে কাঁদতে গাঁজার নেশায় মাতাল স্বামী জামালের কাছে গিয়ে বললো,

ছেলেটার গতরে আগুন, জ্বরে কাঠ হইয়া গেছে, মইরা যাইতাছে, আর আপনে এখানে গাঁজা লইয়া পইড়া আছেন?

জামাল গাজার নেশায় উন্মত্ত হয়ে বললো,

বেয়াদব! পীর বাবার দরবারে বেয়াদবী কথা কইছস! এখানে বইয়া গাঁজা খা, সবের সাথে নাচ । বাচ্চা ভালা অইয়া যাইব ।

এইসব কী কইতাছেন? মরার হালের অসুখ্যা বাচ্চা লইয়া পর-পুরুষের সাথে নাচতাম? এ কথাই কইতাছেন?

হ্যাঁ, এ কথাই কইতাছি । যা কইছি, তা-ই কর ।

এ সময় জামালের শ্বশুর আজগর আলী এসে উপস্থিত । তিনি এতক্ষণ নৌকায় অপেক্ষা করছিলেন । তার জামাতা মেয়ের সাথে গালাগালির সুরে কথা বলছে দেখে নৌকা রেখে তিনি দৌড়ে এসেছেন । তিনি বললেন,

বাবা জামাল, আছিয়া সত্য কথা কইছে । তোমার ছাওয়ালরা ক্ষুধায় মরতাছে । অসুখে ভুগতাছে । তুমি কাজ-কাম রাইখ্যা এইখানে পইরা আছ । তুমি বাড়ি চলো । বউ-ছাওয়ালদের যতন নেওয়া বড় ইবাদত ।

শ্বশুরের দিকে খানিকটা তেড়ে এসে জামাল বললো,

কী কইলেন? পীরের পথ রাইখ্যা আমারে দুনিয়াদারী করার কথা কইতাছেন? ছাওয়ালদের খাওন দেওয়া যদি এবাদত হয়, তাইলে আপনে সেই এবাদত করেন না কেন? যান, আপনে হেই এবাদত করেন, আর আমি এ এবাদত করি।

এবার তিনি অনুনয় করে বললেন,

বাবা জামাল, তোমার শরীরটাও নষ্ট হইয়া যাইতাছে। আমি তোমার ভালা চাই, তোমার পরিবারের ভালা চাই। এরা নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, মাইয়া-পুরুষ দিনরাইত পইরা থাকে এক সাথে। তোমার বউ রাইখ্যা ...

আজগর আলী আর বলতে পারলেন না, কারণ অর্ধ-মাতাল অর্ধ-উলঙ্গ এক গাজাওয়ালা নারী ভীষণ রেগে তেড়ে এলো। বললো,

তুই শালা মারিফতির হাকিকত কী বুঝবি? দয়াল আল্লাহর প্রেম চাইলে পীর বাবার প্রেম চাই। আর গাঁজার জোরে আমাদের সব্বার মধ্যে পীর বাবার প্রেম আছে। সেই প্রেমের জোশে মাইয়া-পুরুষ হইয়া যায় একাকার। দয়াল পীরের প্রেমের জোয়ার প্রেমের ঢেউ বইয়া যায় দেহ থাইক্যা দেহান্তরে। তুই এ মারিফতের কী বুঝবি? এ বলেই সে গান ধরলো...

প্রেমের খেলা দেইখ্যা যা রে দেইখ্যা যা
প্রেমের ঠেলায় ঢুইক্যা যা রে ঢুইক্যা যা।

জামালের বউ আছিয়া এসব দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কোলের রোগা শিশুটিও যেনো মরণের কোলে ঢলে পড়ছে। কী করবে বুঝতে না পেরে সে স্বামীর দিকে এগিয়ে গেলো এবং হাত জোড় করে বললো,

আপনের পায়ে পড়ি। আমার কথাডা হুনেন। এরা আপনারে ভুল পথে লইয়া আইছে। একবার নিজের গতরটার দিকে দেখেন, শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছেন। গাজা খাইতে খাইতে হাঁপানী অইয়া গেছে। খক খক কইরা কাশেন। ঘরে পুলা-মাইয়া না খাইয়া আছে। এ পুলাডার মরার দশা। আপনারে আল্লাহর দোহাই লাগে। ঘরে ফিরা চলেন।

কথা শুনে জামাল রাগে গোস্যায় ফুসে উঠলো। সে গাজায় মাতাল নাচনরত জিগির-ওয়ালা ভক্তদের দিকে একবার তাকালো। মারেফতি লাইনের উঁচুমাত্রার

এসব ওলীউল্লাহর সামনে নিজ বউয়ের মুখে নসীহত শুনে সে যেনো ভীষণ লজ্জা পেলো। ক্রোধে তার দুচোখ রক্তিম বর্ণ হয়ে গেলো। সে এক হুঙ্কার দিয়ে, জট পাকালো ঝাকরা চুলে এক বিরাট ঝাকি দিয়ে এক লাফে বউয়ের উপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং স্ত্রীর কোল থেকে ঝটিকা বেগে রোগা শিশুটিকে টেনে হেঁচড়ে কেড়ে নিলো। আর শিশুটির মুখে এক মুঠো গাজা ঠুসে দিয়ে বললো,

এ নে পীর বাবার ওষুধ। এইটাতেই ভালা অইয়া যাইবি। বউ, হুইন্যা নে। বাড়ি গিয়া বাচ্চার মুখের গাঁজাতে আগুন দিস। নাক দিয়া যে ধুঁয়া বাইর অইব, তা তোরা সবে টাইন্যা শ্বাস নিস। দেখবি, সব্বাই ভালো অইয়া গেছস।

আধমরা শিশুটি তখন বাবার কোলে পরম শান্তিতে চোখ বুঁজে আছে। শিশুটির এ শ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে পিতা জামাল পুনরায় বললো, এ দেখ, গাঁজার গুণে অসুখ ভালা হইয়া গেছে। দেখ, পরম শান্তিতে চোখ বুঝছে। আর কানবি না। ভালা হইয়া গেছে।

জামালের বউ চোখের জলে শিশুটিকে স্বামীর কোল থেকে নিজের কোলে তুলে নিলো। দেখলো, শিশুটি সত্যি পরম শান্তিতে চোখ বুঁজে ঘুমুচ্ছে। ডুকরে কেঁদে উঠে সে তার সন্তানকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরলো বুকে।

শিশুটি সত্যি পরম শান্তিতে চোখ বুঁজলো। সে আর কখনো চোখ খুললো না।

সন্দেশ

পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই। মুরব্বীদের দোয়া চাইতে এসেই এ বিপদ দেখা দিলো। জ্বর বেশি না, তবে দশ-বার দিন হয়ে গেলো। জ্বর পুরোপুরি ছাড়ে না। এ অবস্থায় শিমুর মা কোনোমতেই তাকে হোস্টেলে যেতে দিচ্ছে না। সামনে পরীক্ষা। হোস্টেলে কে তার দেখাশুনা করবে! সেখানে সে কী খায়, তারও ঠিক নেই। জ্বর যদি বেড়ে যায়, কে দেখবে। সময় মতো ঔষধই বা কে দেবে।

শিমুর মুখে রুচি নেই। যা মুখে দেয়, তা-ই তেতো লাগে। খেতে পারে না। ছেলেটা শুকিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়ালে মাথা চক্কর দেয়। মা তাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। লেখাপড়ায় এ যাবত সে ভালই করেছে। এখন যদি পরীক্ষাটা খারাপ হয়ে যায়, তা হলে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াই কঠিন হয়ে যাবে। অন্য ছেলেমেয়েরা তো ভালোয় ভালোয় শেষ করলো। শেষটা ভালোভাবে গেলেই হয়।

স্কুল অবধি শিমু বাড়িতে লেখাপড়া করেছে। বাড়ির কাছের স্কুলটা খারাপ না। প্রতি বছরই ফলাফল ভালো হয়। বেশ নামকরা স্কুল। শিমু নিজেও ভালো ফল করেছে। বাড়ির কাছে কোনো ভালো কলেজ নেই। তাই এখন দূরের কলেজে পড়ে। থাকে হোস্টেলে। মাঝে মাঝে বাড়ি আসে। তবে এ দু'বছরের মধ্যে একাধারে বেশিদিন বাড়ি থাকতে পারেনি। কলেজে ক্লাশ আছে। প্রাইভেটও পড়ে। বেশিদিন বাড়ি থাকলে লেখাপড়ায় ক্ষতি হবে। কাজেই আদরের হলেও মা-বাবাও তাকে তাড়া দিয়ে হোস্টেলে পাঠিয়ে দেয়। আদরের চেয়ে লেখাপড়ার গুরুত্ব বেশি কি না, তাই।

জ্বরের কারণে এবারই শিমু বেশিদিন বাড়ি রইলো। বাধ্য হয়েই থাকতে হলো। এ যাত্রা সে কিছু একটা লক্ষ্য করলো, যা সে আগে এভাবে খেয়াল করেনি।

সকাল হলেই দৌড়ে আসে একটা ছোট মেয়ে। সারাদিন কাজ করে। রাত হলেই চলে যায়। পাশের বাড়ির মেয়ে।

ওর নাম কান্তা। তার বয়স কতো, শিমুর সে আইডিয়া নেই। তবে বয়সে অনেক ছোট। এখনো এমন বয়স হয়নি, যখন বুক ঢাকতে হয়। তার বুকে কাপড় নেই। শুধু বুকই নয়, প্রায় গোটা দেহই উন্মুক্ত। শুধু অতি সংক্ষিপ্ত হাফপ্যান্ট। জাইঙ্গার সাইজের। এ সংক্ষিপ্ত ড্রেসটি কোনো শৈল্পিক আবেশে নয়, অথবা সমুদ্র সৈকতের বিকিনি সংস্কৃতির জন্যও নয়। বরঞ্চ তার দেহ ঢাকার বয়সই হয়নি। অথবা তার মা-বাবা এর চেয়ে দীর্ঘ পোশাক জোগাড় করতে পারেনি। আসলে কান্তার সে অনুভূতির বয়সও হয়নি।

তার দেহে এখনো ফুটে উঠেনি মেয়েলি লাবণ্য। কিন্তু তার মিষ্টি মুখের মাধুরী ও কোমলতা নয়ন ভোলানো। সে দৌড়ে দৌড়ে কাজ করে। যেনো একটা ফুটন্ত ফুল বাতাসের ঝাকুনীতে দোলে। চোখে লাজুকতার বয়স এখনো হয়নি, তবু তার নিষ্পাপ সহজ সরল মেয়েলি চাহনী মন কেড়ে নেয়। মুখে চোখে ভরা লালিত্য।

কান্তার নান্দনিক আকর্ষণ শিমুর জ্বর-নিয়ামক বড়ি। জ্বরের তাপে শীতল ছায়া। সে যখন শিমুর সামনে দিয়ে দৌড়ে যায়, তার মনে দোলা লাগে। এ যেমন সেদিন শিমু তার মাকে বলেই ফেললো,

এতো ছোট মেয়ে কান্তা। তাকে দিয়ে কেন কাজ করাও?

জবাবে তার মা হেসে বললো,

ওকে তার মায়ের অনুরোধে রেখেছি। ওরা অনেক গরিব। কান্তার খাবারও জোগাতে পারে না।

শিমু আবারও কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, ওকে কতো টাকা দাও?

টাকা দিতে হয় না। পেটে-ভাতে খাটে।

তার মানে?

মানে, তার মজুরী নাই। কাজ করে, খাবার পায়।

এবার শিমু অবাক হয়ে বললো-

কিন্তু তা কি ঠিক হলো? সারাদিন কাজ করলো, এক পয়সাও পেলো না!

ওর কাজের তো আমাদের দরকার নেই। বাড়িতে উপোষ করে বলেই ওর মা অনেকটা জোর করেই দিয়ে গেলো। আর বললো, খাবার দিলেই হবে।

শিমুর মনে বিষয়টা কেমন জানি লাগলো। কিন্তু কিছুই করার নেই। সমাজের আকাশে বাতাসে কতো কান্তার আহাজারি প্রবাহিত। তার খোঁজ ক'জনে রাখে।

বিকেলে শিমুকে দেখতে এলো তার ছোট মামা আসগর সাহেব। সাথে আনলো কিছু আঙ্গুর। দামী ফল। গ্রাম-গঞ্জে তেমন একটা পাওয়া যায় না। শিমু মজা করেই খেলো। সে উৎকণ্ঠা ও মনোবেদনার সাথে লক্ষ্য করলো, কান্তার ভাগ্যে কিছুই জোটেনি। শিমু তার মাকে জিজ্ঞেস করলো,

মা, কান্তা কি আঙ্গুর খেয়েছে?

প্রশ্ন করতেই শিমু খেয়াল করলো মা কিছুটা বিরক্তির ভঙ্গিতে বললো,

তা, তুমি কান্তাকে নিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেনো? সে তো আঙ্গুর চিনেও না।

শিমু আর কথা বাড়ালো না। সে একটা ছেলে। কাজের মেয়েকে নিয়ে এতো আগ্রহ দেখালে তার মা আবার কী মনে করে, তারও ঠিক নেই। কাজেই চুপ থাকাটাই ভাল।

জ্বরে খাবার রুচি থাকে না। তবে কোনো কোনো সময় কোনো খাবার খেতে ইচ্ছে করে। শিমুর ইচ্ছে হলো সন্দেশ খাওয়ার। মা'কে সে এ ইচ্ছার কথা জানালো। মা সন্দেশ জোগাড়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। কাছের বাজারে সন্দেশ পাওয়া যায় না। তাই দূরের বাজার থেকে সন্দেশ আনার চিন্তা হলো। একদিন পর পাওয়া যেতে পারে।

বিকেলে কী কাজে কান্তা দৌড়ে যাচ্ছিল শিমুর সামনে দিয়ে। শিমু জিজ্ঞেস করলো,

কান্তা, তুমি কি সন্দেশ পছন্দ করো?

সন্দেশ সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় কিছুটা অবাক হয়ে কান্তা আবার শোনার জন্য জিজ্ঞেস করল, কী কইলেন, মন্দেজ? মন্দেজটা আবার কী?

শিমু হাল ছেড়ে দিয়ে বললো, না, কিছু না।

পরের দিন বুলু মিয়া সন্দেশ নিয়ে এলো দূরের বাজার থেকে। এসেই শিমুর মা'কে বললো,

খালা, এতো দূরে গেলাম। বাজারটায় মাত্র একটা মিষ্টির দোকান। সন্দেশের গ্রাহক কম থাকায় তারা অল্প সন্দেশ বানায়। আমি পৌছতে পৌছতে বিক্রি প্রায় শেষ। মাত্র কয়েকটা পেলাম। তা-ই নিয়ে এলাম।

সাবাস। কপাল ভালো, কয়েকটা যে পেয়েছিস। জ্বরের মুখে ইচ্ছে হয়েছে। তাও যে দিতে পারলাম।

এ বলে শিমুর মা সন্দেশ নিয়ে দৌড়ে গেলো ছেলের কাছে। আর একটা শিমুর মুখে উঠিয়ে দিয়ে খাওয়ালো। শিমু বললো,

মা, তুমিও খাও।

না বাবা, তুমি খাও। জ্বরের তেতো মুখে সন্দেশ খেতে ইচ্ছে করছে। ভাগ্যিস, এ কয়টা পাওয়া গেলো। তুমি খাও।

তা হলে রিমির জন্য দু'টো রেখে দাও।

কী দরকার? তার তো কাল বাড়ি আসার কথা। কাল আসে, নাকি পরশু আসে, তারও ঠিক নেই। গতবার তো তোমার বাবা একাই ফিরে এলো, রিমি এলো না।

তবে বাবার জন্য রাখো দু'একটা।

ছেলের এ বায়নাতে মা কিছুটা আদরমিশ্রিত ধমকের সুরে বললো,

তোমার হলো কী শুনি? তোমার বাবা বহু সন্দেশ খেয়েছে। তাছাড়া সন্দেশ কয়দিন ভালো থাকে? সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। খেয়ে ফেলো দেখি!

সকালে শিমুর ঘুম ভাঙ্গলো পিঁপড়ার কামড়ে। পিঁপড়ার সে যেমন-তেমন কামড় না। বাড়িতে হুলস্থুল লেগে গেলো পিঁপড়ার কাণ্ডকারখানায়। শিমুর বালিশ-বিছানা ভরে গেছে পিঁপড়াতে। শিমু ও শিমুর মা পিপড়া মেরে শেষ করতে পারছে না। পিঁপড়ার ভীড় বালিশের দিকে বেশি। তা দেখে শিমুর মা বালিশের পিঁপড়া মারতে চাচ্ছে। কিন্তু শিমু বলে: মা, তুমি ওদিকে মারো, আমি এদিকে মারি। শেষ পর্যন্ত শিমু কুলোতে পারছে না দেখে শিমুর মা বালিশ উঠিয়ে ঝাঁকি দিলো। আর বালিশের নিচে থেকে বেরিয়ে এলো এক সন্দেশ। শিমুলের মা তার দিকে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

ততক্ষণে একটা ঝাড়ু নিয়ে এসে উপস্থিত হলো কান্তা। তাকে দেখেই শিমু বললো: কান্তা, তুমি সন্দেশটা খেয়ে ফেলো তো!

আর মা'র দিকে তাকিয়ে বিড়বিড়িয়ে বললো,

পিপড়াওয়ালা সন্দেশ আমি খেতে পারবো না।

সুফিয়া

বাবুলের খ্যাতি ও দাপট দেখে তার মা শেফালী খুবই আনন্দিত। কলেজে তার জনসমর্থন এতো বেশি যে, তার ডাকে ক্ষণিকের মধ্যে শত শত ছাত্র-ছাত্রী বটতলায় এসে উপস্থিত হয়। ডাকও দিতে হয় না, তার শক্তিধর বাহিনী আছে। তারা ইঙ্গিতেই কাজ করে। বাবুলের অঙ্গুলি হেলনে পিঁপড়ার ঝাকের মতো তারা ডানে বললে ডানে যায়, আর বায়ে বললে বায়ে যায়। যারা সায় দেয় না তারা ছাত্রদের স্বার্থবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল। আর এ বিশেষণে পরিচয় লাভ করলে রক্ষে নেই।

বাবুলের শক্তি শুধু কলেজের ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয়। কলেজের দাপট ও ক্ষমতা বাইরের জগতেও বিস্তার লাভ করেছে। এই তো সেদিনের কথা। ইভটিজিংয়ের কারণে তসু মিয়া সামাজিক আক্রোশের শিকার হয়। সে বাবুলের নিকট গিয়ে অভিযোগ করলো এবং আশ্রয় চাইলো যে, চান মিয়া তার প্রতি বাঁকা চোখে তাকিয়ে ছি ছি দিয়েছিল। এরপর বাবুলের দল তার বাঁকা চোখটিকে সোজা করে কাঁঠালের কোষের মতো উঠিয়ে নিলো। আর সে ইভটিজিং মেয়েটির জন্য বাইরে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। মুখের টিজিং হাতের টিজিং-এ রূপান্তরিত হলো।

এমনি ক্ষমতা বাবুলের। কলেজ ও কলেজের বাইরে তার জয়-জয়কার। তার বাহিনীর নিকট মাথা নত করে না, এলাকায় কেউ আছে কি না সন্দেহ। ক'দিন আগেই এক জমির সীমানা নিয়ে দু'দলে ঝগড়া হয়ে গেলো। বুদ্ধি করে বিবাদমান এক পক্ষ বাবুল বাহিনীর সাহায্য চাইলো। মোটা অংকে সাহায্য চুক্তি হলো। তবে অপর দলটিও বাবুলের নিকট এসেছিল। কিন্তু বোকার দলটি 'আগে আসলে আগে পাবে' কথাটির মাহাত্ম হয়তো বুঝতে পারেনি। মাত্র কয়েক ঘণ্টা

পরে আসার কারণে সুযোগটি তাদের হাতছাড়া হলো।

বাবুলের এ অবস্থানের পেছনে বাবুলের মা'র অবদান অনেক। এতে তার মা শেফালীর বিনিয়োগ বিরাট। বাবুল তার একমাত্র ছেলে। স্বামী ব্যবসায়ী। ছেলের জীবনের উন্নতির জন্য তার হাত উন্মুক্ত। ছেলের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্ত্রীর প্রতি অসীম ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া আছে। ছেলে যা চায়, তা-ই দিতে হবে। শত হলেও সন্তানের জন্যই তো মা-বাবার সব কিছু।

কিন্তু এ দুনিয়ার হালচাল ভালো না। কেউ কারো উন্নতি দু'চোখে দেখতে পারে না। কেউ উপরে উঠলে অন্যরা তাকে টেনে নিচে নামাতে চায়। মানুষের মন হিংসায় ভর্তি। এর বড় প্রমাণ হলো বাবুলের চাচী সুফিয়া। একদিন সুফিয়া এসে শেফালীকে বললো,

বোন, একটা কথা বলতে চাই। বেশ কিছুদিন যাবত বলবো বলবো ভাবছি। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছি না। এছাড়া কী মনে করেন জানি না। এ দ্বিধায়ও বলা হয়নি।

তা বলো। দেবরের বউ তুমি, যা ইচ্ছে হয় বলতে পারো। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোনো কারণ নেই।

ভাবির এ অভয় বাণী সত্ত্বেও কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে সে বললো,

বলছিলাম কী ... আপনার ছেলে বাবুলের কথা।

বাবুলের মা মুখে তৃপ্তির হাসি হেসে বললো,

কী বললে? বাবুলের কথা? সে কথা তো বলবেই। বাবুল শুধু আমাদের গর্ব নয়, বংশের গর্ব। তার নাম শুনলে সব ঠাণ্ডা। এ বংশের কোন মায়ের ঘরে এমন ছেলে জন্ম নিয়েছে?

মনের মধ্যে দু-একটি প্রশ্ন লুকিয়ে রেখে বাবুলের চাচী তার ভাবির কথায় সায় দিয়ে বললো,

তা ঠিক ভাবি। কিন্তু তার ভবিষ্যৎ কী চিন্তা করেছেন?

বাবুলের মা তার সন্তানের নিশ্চিত ভবিষ্যতের আত্মবিশ্বাস থেকে বললো,

কী বললে? তার ভবিষ্যৎ? এই বয়সেই যদি তার এতো প্রতিষ্ঠা, তখন তার ভবিষ্যৎ কতো উজ্জ্বল, তা কি কোনো চিন্তার বিষয়?

না ভাবি, বলছিলাম কি ... । বলছিলাম, তার তো লেখাপড়ায় উন্নতি হচ্ছে না ।

তার বাহিনী তো চিরকাল থাকবে না । তাকে তো নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে ।

বাবুলের চাচীর এরকম বক্তব্য বাবুলের মা তেমন একটা আশা করেনি । হঠাৎ তার মনের মধ্যে কিছুটা নারীসুলভ ক্রোধ ও হিংসা জেগে উঠে । সে বলে,

এবার বুঝতে পেরেছি । তোমার ভেতরে হিংসার আগুন জ্বলছে । সমাজে বাবুলের যে সম্মান, তার এক বিন্দুও তোমার ছেলে শফিকের নেই । শফিক তো বাবুলের এক ক্লাশ উপরেই পড়ে । কিন্তু কেউ কি তার নাম জানে?

এ কথা শুনে বাবুলের চাচী কিছুটা বিব্রত বোধ করে । পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সে বললো,

ভাবি, আমি তো এতো বুঝি না । যা বুঝলাম, তা-ই বললাম ।

কিন্তু বাবুলের বর্তমান সাফল্য তার মাকে এতই অন্ধ করে রেখেছে যে, তার অদূর ভবিষ্যতের সরল অঙ্কটা করতে তার ভুল হয়ে যায় । দেবর বউকে সে বলে,

অন্যের সাফল্যে কখনো হিংসা নিও না । আর শুনে রাখো, বাবুলের এ ক্ষমতার জন্য কম কাঠখড় পুড়াতে হয়নি । ওর বাবা আমাকে যা দেয়, তা আমি উজাড় করে বাবুলকে দিয়েছি । পয়সা ছাড়া কি প্রতিষ্ঠা হয়?

সুফিয়া আর কথা বাড়ালো না । সে জানতে পেরেছে, বাবুলের হাতে তার মা প্রচুর টাকা-পয়সা দেয় । সে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তা খরচ করে । আড্ডা মারে । সিনেমা দেখে । নেশা করে । এমন কি মাঝে মাঝে পতিতাদের খাতেও বেশ খরচ হয় । এভাবেই বাবুল তার দল গঠন করতে পেরেছে এবং দলকে শিশা-ঢালা প্রাচীরের মতো মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে ।

কিন্তু বাবুলের মা'র উদ্দেশ্য মহৎ । তার উদ্দেশ্য হলো বাবুলের উন্নত জীবন । অর্থের অভাবে সমাজের বহু সন্তান এগিয়ে যেতে পারে না । বাবুলের ক্ষেত্রে যেনো তা না হয় । বিশেষ করে তার প্রতিযোগিতা হলো সুফিয়ার সাথে । দেবরের ছেলের সাথে । ভাইয়ে ভাইয়ে প্রতিযোগিতা তো থাকেই । শেফালীর স্বামী ও তার দেবরের মধ্যেও প্রতিযোগিতা আছে । শেফালী কোনোমতেই চায় না, সুফিয়ার ছেলে শফিক তার ছেলের উপরে যাক ।

বাবুল তিন তিন বার ফেল করেছে। শেষ পর্যন্ত সে কোনোমতে কলেজ পার হলো। পার হলো বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু তার মতো বিচক্ষণ ছেলের পক্ষে এ সমস্যা থেকে উত্তরণে তেমন অসুবিধা হলো না। অনায়াসেই সে তার কলেজ বাহিনীর মতো একটা শক্তিশালী ছাত্র বাহিনী বের করে নিলো। তাদের মদদে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেলো, যদিও ভালো কোনো বিভাগে ভর্তির সুযোগ হলো না। তবে তার বুঝতে অসুবিধে হলো না, কোন্ বিষয়ে ডিগ্রী হলো তা বড় কথা নয়, বরং আসল ব্যাপার হলো ফলাফল। যে কোনো বিষয়ে ভালো ফল করতে পারলেই হলো। ব্যাস।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা লাভেও বাবুলের দেরি হলো না। ভর্তি প্রক্রিয়ায়ই এক বাহিনীর সাথে তার বেশ খাতির হয়ে গেছে। কয়েক মাসের মধ্যেই সে এই বাহিনীর একজন নেতায় পরিণত হলো। কলেজ জীবনের মতোই এখানেও তার ক্ষমতা ও দাপটের রাজত্ব তৈরি হয়ে গেলো।

ছাত্রাবাসের তিন তলায় তার রুম। সেখান থেকে ক্যান্টিন দেখা যায়। সকালে সে চিৎকার করে বলে দেয়, নাস্তার জন্য কি পাঠাতে হবে। ক্যান্টিনের বয় নাস্তা নিয়ে যায় তার রুমে। খাওয়া শেষ হলে জানালা দিয়ে প্লেটগুলোকে ছুঁড়ে মারে সে। ভেঙ্গে তা চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু কারো কিছু বলার ক্ষমতা নেই।

তবে অসুবিধা হলো অন্যদিকে। কলেজ-বাহিনীতে তার ছিল একচ্ছত্র ক্ষমতা, মনোপোলি। ইউনিভার্সিটিতে তেমন নয়। তার বাহিনীতেই একাধিক নেতা ও নেতৃত্ব। তাছাড়া প্রতিযোগী বাহিনীও রয়েছে বেশ কয়েকটি। এক একটা বাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় চলে। কাজেই কোন বাহিনীর উত্থান মানে অন্য বাহিনীর পতন। এভাবে চলে উত্থান-পতনের প্রতিযোগিতা। লেগে থাকে মারামারি। হানাহানি। এমন কি অস্ত্রের ঝনঝনানি।

ইতোমধ্যে শফিক লেখাপড়া শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গেছে। এরপর সে বিসিএস পরীক্ষা দিয়েছে। ভালোভাবে উত্তীর্ণও হয়েছে। তার বাবা-মা আনন্দে আত্মহারা। তাদের ছেলে একদিন সচিব হবে, দেশের নীতি নির্ধারণী অবস্থানে উত্তীর্ণ হয়ে দেশ চালাবে। সম্মান করবে সবাই। পিতা-মাতার মুখ উজ্জল হবে। শফিক মিষ্টি নিয়ে বাড়ি গেলো। সুফিয়া সে মিষ্টির সাথে আরো মিষ্টি কিনে আত্মীয়-স্বজনের ঘরে পাঠালো। বাবুলের মার ঘরেও দেওয়া হলো। কিন্তু বাবুলের মা সে মিষ্টির প্যাকেটটিকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে মারলো। সুফিয়া মনে

কষ্ট পেলো। কিন্তু তবু তার খুশির শেষ নেই। রাতে সে স্বামীর সাথে এক বালিশে শুয়ে বললো,

আল্লাহর শুকরিয়া ! আলহামদুলিল্লাহ! আজ আমি কতো খুশি, তোমাকে বুঝাতে পারবো না।

আমি আরো বেশি খুশি। শফিক তো আমাদের বংশের বাতি। আর এ জন্য তোমাকে বিশেষ ধন্যবাদ।

কেন? আমি কী করলাম? আমাদের দু'জনেরই তো ছেলে সে। তুমিই তো এর লেখাপড়ার খরচ চালালে।

ধন্যবাদ এজন্য যে, আমি দিলাম, আর তুমি দিলে না।

কী বললে? আমার উপর অভিযোগ দিচ্ছো?

না, বউ। অভিযোগ নয়, এটা হলো প্রশংসা।

তুমি বড্ড বেশি বেশি করছো। আমার দোষ দিচ্ছো, আবার বলছো প্রশংসা করছো।

তুমি একটা আস্ত বোকা বউ। তবে কাজ করেছো মহাজ্ঞানীর। তুমি তো ছেলের হাতে টাকা তুলে দিয়ে তাকে নষ্ট করোনি। যা দরকার নিজে কিনে দিয়েছো। বাবুল যেখানে হাতে টাকা পেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে তুমি ছেলের হাতে টাকা না দিয়ে সোনা সৃষ্টি করেছো। এই বলে স্বামী সুফিয়াকে জড়িয়ে ধরে বললো,

তুমি কি জানো, তুমি কী?

বাবুলের চাচী কম বয়সী কিশোরীর মতো খিল খিলিয়ে উঠল। বাবুলের চাচা অবুঝ বালকের সুরে বললো,

তুমি একটা বোকা সুফিয়া।

মিষ্টি সুফিয়া!

দুষ্টু সুফিয়া!

প্রতি উত্তরে বাবুলের চাচী অস্পষ্ট স্বরে দুষ্ট হাসি হেসে বললো,

কী বললে? দুষ্টু সুফিয়া? দুষ্টু ...? তা হলো আসো দুষ্টুমি দেখাই!

এই বলে সুফিয়া স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তার গালে দাঁত বসিয়ে দিলো। এভাবে তারা হারিয়ে গেলো এক নয়া মধুচন্দ্রিমায়।

রাত চারটা। ক্রিং করে ফোন বেজে উঠলো। ওপারে আছে শেফালী। সে রোদন করে বললো,

আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো রে বোন! আমার বাবুল আর নাই। গোলাগুলিতে সব শেষ হয়ে গেছে।

আমার সর্বনাশ ...

নারী

ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবার ফ্লেচার আরগু বিল্ডিং। এখানেই অর্থনীতি বিভাগ। উইনিপেগের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও খ্রিস্টান ধর্মযাজক রবার্ট ফ্লেচার আরগু (১৮৭৭-১৯৬২)-এর নামে অতীব নান্দনিক স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন এ বিল্ডিং। অত্যন্ত প্রশস্ত ও দীর্ঘ এ দালানে অগণিত মানবীয় কপোত-কপোতীর রোমান্টিক মেলা বসে। ডাউন টাউনের কোলাহল থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত এ পরিবেশে রোমান্টিকতায় কোনো বাধা নেই। জোড়ায় জোড়ায় বসে হেসে খেলে চলে সারাদিন। দিনরাতের এ মুখরিত অঙ্গন।

পশ্চিমা জগৎ এমনিতে নারী স্বাধীনতা, প্রগতি ও নারী-ক্ষমতায়নের দেশ। মাধুর্যের আবেশের এ ক্ষমতায়ন যেনো এ চত্বরে পেয়েছে নতুন মাত্রা। করিডোরে এ মধুর আবেশের ছড়াছড়ি। চারদিকে আর্টিস্টিক সংক্ষিপ্ত পোশাকে কোমল দেহ দুলে বেড়ায় অহরহ।

দু'একজন ছাড়া অর্থনীতি বিভাগে সব শিক্ষকই সাদা। শুধু কয়েকজন এশিয়ান। কোমল নারীত্বের উচ্ছলতায় এসব সংখ্যালঘুদের অবস্থা ত্রাহি মধুসূদন। নারী রাজত্বের ছোট্ট গুহায় কচ্ছপের মতো তারা যেনো একটু বেরিয়ে উঁকি দেয়, আবার লুকিয়ে নেয় মাথা।

সকাল দশটায় ক্লাসে ঢুকলেন আজমল সাহেব। ছোট্ট ক্লাস। ত্রিশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশজনই মেয়ে। আজমল সাহেব ক্লাসে ঢুকার পরই একটু অস্বাভাবিক অবস্থা লক্ষ করলেন। মেয়েরা যেনো কেমনভাবে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে, যেনো কোনো ষড়যন্ত্র আছে। আজমল সাহেব এরকম ভাব দেখালেন, যেনো তিনি কিছুই আঁচ করতে পারেননি। বরাবরের মতো তিনি শুরু করলেন

লেকচার। এমন সময় তিনি লক্ষ্য করলেন, একটা মেয়ের পেটে আরেকটা মেয়ে খোঁচা দিয়ে কী ইঙ্গিত করলো। তখন সে মেয়েটি হাত উঁচু করে বললো,

স্যার, আমার কিছু কথা আছে।

আজমল সাহেব নিজের কৌতুহল দমিয়ে রেখে আদর্শ শিক্ষকের মতো ভদ্রতার সুরে বললেন, বলো। কী কথা আছে তোমার, বলো।

স্যার, আপনি নাকি নারীদেরকে ঘৃণা করেন। তাদেরকে হীন ভাবেন। আপনি মানে আপনারা, অর্থাৎ এশিয়ান পুরুষেরা নারীদেরকে মানুষ বলে মনে করেন না। তা হলে আপনাকে কীভাবে মেনে নিতে পারি?

মেয়েটি এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলো। যেনো পুঞ্জিভূত ক্রোধের বাণ ছুড়ে মারলো আজমল সাহেবের প্রতি। আজমল সাহেব এমন কোনো কিছুর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি একটু অপ্রস্তুত হলেন। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,

তুমি কী বলতে চাচ্ছো, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা। আমি তো আমার মা-কে পরমভাবে শ্রদ্ধা করি, বোনকেও আদর করি। ঘৃণা করব কেন?

কিন্তু মেয়েটিও হার মানতে নারাজ। প্রতিউত্তরে সে বললো,

স্যার, আমি কী বলতে চাচ্ছি, আপনি অবশ্য বুঝতে পারছেন। এশিয়াতে নারীরা অবহেলিত, বঞ্চিত। তাদেরকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। তারা গাধার মতো খাটে। সন্তান জন্ম দেয়, লালন পালন করে, রান্না করে। কিন্তু কোনো মর্যাদা পায় না। তাদের উপর চলে অকথ্য নির্যাতন। ইচ্ছা করলেই ডিভোর্স দিয়ে কান ধরে বের করে দেওয়া যায়। বলুন, আপনি বলুন, এসব ঠিক কি না?

আজমল সাহেব কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তার মাথায় কিছুই আসছে না। ক্লাসে বক্তৃতার যে বিষয়বস্তু তিনি চিন্তা করে এসেছেন, তাও হারিয়ে গেছে। একবার ভাবলেন, আজকের ক্লাস ছুটি দিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু তার পরিণামও খারাপ হতে পারে। ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে। আর সাদা দেশের গোটা পরিবেশটাই তো এশিয়ানদের জন্য প্রতিকূল। কাজেই দ্রুত কিছু ভেবে তিনি ঠিক করলেন, ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টি আলোচনা করবেন। তাই ভেবে চিন্তে তিনি বললেন,

হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই বলেছ। এশিয়ার নারীরা শিক্ষা থেকে আসলেই বঞ্চিত। সেহেতু তাদের কর্মক্ষেত্রও সীমিত। তারা সমাজের উচ্চস্থানে আসীন হতে পারে না।

আজমল সাহেবের কথা শুনে তারা বেশ খুশি হলো। তারা তাকে এসব ব্যাপারে নিজ দেশের পত্র পত্রিকায় লেখার পরামর্শ দিলো। আজমল সাহেব বললেন, এটা ভালো পরামর্শ। আমি এ ব্যাপারে লিখবো। আমার বন্ধুদেরকেও লিখতে বলবো।

এবার শিক্ষার্থীরা কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বললো,

এই তো ভালো কথা। আপনারা যারা উন্নত দেশে নারীদের অবস্থা দেখেন, তারা যদি নিজ দেশের পত্রিকায় লেখেন, তা হলে ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হবে। আপনারা কিন্তু অবশ্যই লিখবেন। ঠিক আছে, তা হলে এবার ক্লাস শুরু হোক।

ক্লাস শুরু করার কথা বললেও আজমল সাহেবের মনের মধ্যে যে কথাগুলো আটকে আছে তা প্রকাশ করতে না পারায় তিনি অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। কিছুটা সময় নিয়ে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে তিনি আবার শুরু করলেন,

হ্যাঁ, ক্লাস শুরু হবে। তবে একটা কথা। আমি এদেশের নারীদের অবস্থা ভালো করে জানিনা। যা জানি, উপরে উপরে, ভাসা ভাসা জানি। লিখতে হলে আরেকটু গভীরভাবে জানা দরকার। তোমরা যদি সাহায্য করো, তা হলে আমি আরেকটু জেনে নিতে চেষ্টা করি।

উৎসুক ছাত্রীরা সমস্বরে বলে উঠল,

তা বেশ। তা ভালো হবে। তা হলে বলুন, কী জানতে চান। আমরা সবকিছু বলে সহযোগিতা করবো।

ধন্যবাদ। আচ্ছা, এদেশে তো নারী-পুরুষ সবাই লেখাপড়া করে। এতে সবার সমান অধিকার। তাই না?

তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। ইউনিভার্সিটিতে তো মেয়েদের সংখ্যাই বেশি।

ঠিক বলেছ। আচ্ছা, চাকুরিক্ষেত্রেও তো সবার সমান অধিকার, তাই না?

মেয়েরা আনন্দচিত্তে বললো, অবশ্যই।

অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়েই উপার্জন করো। সংসারের জন্য উভয়ের আয় সমান।

তা তো বটেই। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই চাকুরি করে। বেতনও পায় সমান। সংসারে সমান অবদান রাখে। দেশের উন্নয়নে নারী-পুরুষ উভয়েই সমান।

খুবই ভালো কথা। এটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এটা হলো বাইরের কথা। আমি ভেতরের কিছু কথা জানতে চাই।

আচ্ছা বলুন, কী জানতে চান?

আমি দু'একটা প্রশ্ন করি। আমাকে জানতে সাহায্য করো। আচ্ছা, তোমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিকেলে চাকুরি থেকে ফেরার পর বাসায় বসে যখন একটু চা খাও, সে চা কে বানায়?

এটা তো মেয়েদের কাজ।

চা খাওয়ার পর কাপ-পিরিচ কে পরিষ্কার করে?

এটা কি পুরুষ করবে নাকি? মেয়েরাই তা করে।

দুপুরের খাবার তো অনেকে অফিসের ক্যান্টিনেই সেরে নেয়। আচ্ছা, রাতের খাবার কে রান্না করে?

কী বলছেন আপনি! রান্না ঘরের কাজ কি পুরুষরা করে নাকি?

আচ্ছা, ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়া, ঘর-দুয়ার ঝাড়ু দেয়া, এসব কাজগুলো?

এবার মেয়ে শিক্ষার্থীরা হতচকিত হয়ে সমস্বরে বললো,

আপনার কি মাথা খারাপ? এসব কি পুরুষের কাজ? মেয়েরাই তা করে।

আচ্ছা, সন্তান ধারণ? সন্তান প্রসব? নবজাত শিশুর সেবা?

আপনি সত্যি পাগলের মতো কথা বলছেন। মা ছাড়া এসব কাজ কে করবে?

আজমল সাহেব বললেন, হুঁ। একটু মাথা চুলকিয়ে তিনি পুনরায় বললেন,

তোমাদের দেশে নারীর গুরুত্ব তো অনেক বেশি। সমান লেখাপড়া, সমান চাকুরি ও সমান আয় সত্ত্বেও মেয়েদের ক্ষমতা তো অনেক বেশি। সব কাজ ও কর্তৃত্ব তো তাদেরই হাতে।

এবার সত্যিই ধরতে পারছেন স্যার। একেই বলে women empowerment.

এমন সময় এক মেয়ে বললো,

স্যার, এশিয়ান মেয়েদের যে করুণ অবস্থার কথা শুনি, তা শুনে অনেক কষ্ট হয়। তা জানতে বড় কৌতুহল হয় আমার। একটু বলুন না, স্যার।

তাই নাকি! সত্যিই শুনতে চাও? সবাই কী বলো?

এক বাক্যে সবার উত্তর, স্যার বলুন।

আজমল সাহেব একটু থামলেন। মাথা চুলকালেন। হয়তো ভাবছেন, কী বলবেন। এরপর বললেন-

তোমরা ঠিকই বলেছো। আমাদের দেশের নারীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তারা খুব কমই শিক্ষা পায়। লেখাপড়া না করেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। তারা চাকুরি করে না। ঘরে বসে থাকে।

ঘরে বসে তারা কী করে?

আজমল সাহেব হালকা হাসলেন। তারপর বললেন,

তাদের থাকে একজন বা দু'জন মেইড। মেইডরা রান্না করে, কাপড় ধোয়, ঘর ঝাড়ু দেয়। কাপড় চোপড় ধোয়ার কাজ করে।

আশ্চর্য হয়ে মেয়েদের একজন জিজ্ঞেস করল,

তা হলে ঘরের স্ত্রী কী কাজ করে?

ঘরের স্ত্রী টেলিভিশন দেখে। অফিস শেষে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে। স্বামী এলে হাসিমুখে স্বাগত জানায়। মেইড চা বানিয়ে দেয়। দু'জনে বসে খোশগল্প করতে করতে চা খায়। সন্তানরা মনে করে মায়ের পায়ের নিচে স্বর্গ। কাজেই তাদের সেবা করে। বুড়ো হয়ে গেলে সকল সম্মানের কেন্দ্রবিন্দু হয় মা ।

কী বললেন স্যার! বুড়ো হয়ে গেলে! তার মানে বিয়ে সারা জীবন টিকে থাকে!

হ্যাঁ, বিয়ে সারা জীবনের জন্যই হয়। সারা জীবনই বিয়ে টিকে থাকে।

পুরো ক্লাসে যেনো একটি ঝড় বয়ে গেল। মেয়েদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেলো। কেউ বলছে, তারা তো আমাদের চেয়ে ভালো। কেউ বলছে, তাদের জীবন তো

রাণীর মতো। কেউ বলছে, সারা জীবনের জন্য বিয়ে! কতো ভালো। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

ক্লাস শেষ হলো। পরের দিন আমজাদ সাহেব অফিসে বসে আছেন। এমন সময় গতকালের ক্লাসের এক মেয়ে এসে বললো,

স্যার, আপনাদের দেশের মেয়েদের বিয়ে কি সত্যি সারা জীবন টিকে থাকে?

আজমল সাহেব তার স্বভাবসুলভ আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ, থাকে।

মেয়েটি তখন লাজ নম্র মৃদু কণ্ঠে বললো, স্যার, আপনি কি বিয়ে করেছেন?

লাল বউ

উইনিপেগ শহর। কানাডার ম্যানিটোবা প্রদেশের রাজধানী। বরফের দেশ। ঘরের বাইরে যেনো এক টুকরো সূর্য ঝরে পড়ে আগুনের মতো রোদ ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই তো এর নাম sunny manitoba। কিন্তু বাইরে হাড় কাঁপানো শীত। তাপমাত্রা মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রা শূন্য হলেই পানি জমে বরফ হয়ে যায়। এই মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় এক গাদা গরম কাপড়ের ভেতর দেহটাকে ঢুকিয়ে দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠতে হয়। কয়েক মিনিট নাক খোলা থাকলে জমে শক্ত কালো হয়ে যায়। আর ঝকঝকে রোদে তুলার মতো বরফ উড়ে পড়ে। রাস্তাঘাট মাঠ-ময়দান তুলাময় বরফে ঢেকে যায়। যেনো শুভ্র নম্র কার্পেট বিছানো সর্বত্র।

হাশেম এই শহরের ইউনির্ভাসিটি অব ম্যানিটোবা থেকে পিএইচডি করেছে। দশ বছর হয়ে গেছে এ শহরে। এ শহরের ইউনিভার্সিটি অব উইনিপেগে তার চাকুরিও হয়েছে। পার্শেল স্ট্রীটে বাড়ি করেছে। বিয়ে করেছে এক ইহুদি সাদা মহিলাকে। দুজনে আছে বেশ আনন্দে। আজ তার বাসায় টি-পার্টি। এ বাড়িতে প্রায়ই টি-পার্টি হয়। কিন্তু আজকেরটা ভিন্ন। অন্য সময় সাদা কানাডীয়দের পার্টি হয়। হাশেমের বউ ম্যারীর বন্ধু ও বান্ধবীরাই চায়ের দাওয়াত পায়। তবে আজ দাওয়াত হলো হাশেমের বাঙালি বন্ধুদের, যদিও ম্যারীর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ক্রিস্টিনও আমন্ত্রিত।

বিকেল পাঁচটা। পাঁচজন মেহমান এসেছে। লিভিং রুমে বসেই কথা-বার্তা গল্প-গুজব হচ্ছে। হাশেম কখনো তাদের সাথে বসে, আবার কখনো উঠে ভেতরে যায়। হাশেমের বন্ধু জসীমের মনে কৌতূহল ছিল, এ যাওয়া আসার রহস্য কী।

কিন্তু এ রহস্য বুঝতে তার আর দেরি হলো না। ম্যারী হাশেমকে লক্ষ্য করে বললো,

এখনো চা তৈরি হয়নি? চা নিয়ে এসো।

হাশেম বুঝতে পারলো, সে চা তৈরি করতে বড্ড দেরি করে ফেলেছে। কাজেই অপরাধীর মতো সে হুড়মুড় করে দ্রুত কিচেনের দিকে গেলো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চায়ের ট্রে নিয়ে এসে হাজির। তার বউ ম্যারী বললো,

এই তো আমার গুড বয়!

হাশেম এবার ম্যারী ও ক্রিস্টিনের কাপে চা পরিবেশন করে দিলো। হাশেমের বন্ধুদেরকেও পরিবেশন করে দিতে চাইলো। কিন্তু তারা নিজেই নিয়ে নিলো।

এবার চা খাওয়া। খোশগল্প করা। বাঙালি মেহমানদের মধ্যে হাসানই হাশেমের পুরনো বাল্যবন্ধু। তারা দু'জনে একই সাথে কানাডা এসেছে। হাসান হাশেমের এ বাসায় পূর্বেও এসেছে। অন্যরা নতুন এসেছে। এই প্রথম তারা হাশেমের বউকে দেখে। কাজেই তাদের কাছে হাশেমের বউ ম্যারীর মর্যাদা তুলে ধরার দায়িত্ব তার বান্ধবী ক্রিষ্টিনের উপরই বর্তায়। সে এক পর্যায়ে নতুন মেহমানদেরকে লক্ষ্য করে বললো,

তোমাদের বন্ধু হাশেম বড়ই লাকী, বড়ই ভাগ্যবান। সে ম্যারীর মতো সহধর্মীনী পেয়েছে। ম্যারীর মতো কিউট মেয়ে বিরল।

একথা শোনার পর ম্যারীর মুখে আত্মতৃপ্তির এক সহজাত হাসি ফুটে উঠলো। হাশেমের বন্ধু জসীম বললো,

তা তো বটেই। এমন সুন্দরী পৃথিবীতে কয়জন আছে।

এ কথা শুনে হাশেমের মুখে-চোখে আনন্দের রেখা ফুটে উঠলো। ক্রিষ্টিন বলে চললো,

ম্যারী কতো আকর্ষণীয়া, তা তোমরা বুঝতে পেরেছ? দশ বছর বয়সে তাকে র‍্যাপ করা হয়েছিল। যেমন কিউট মেয়ে দেখলে যুবকরা পাগল হয়ে যায়, তেমন মেয়ে হলো ম্যারী।

হাসান এ কথার ব্যাখ্যা করে দিলো, নয়তো কেউ ভুল বুঝতে পারে। হাসান বললো,

উন্নত দেশে সবচেয়ে সুন্দরী ও আকর্ষণীয় মেয়েদের প্রতি সব যুবকদের নজর পড়ে। কেউ কেউ পাগলের মতো হয়ে যায়। সম্মতিতে সম্ভব না হলে তারা অনেক কৌশলে সুযোগ বুঝে র‍্যাপ করে। উন্নত দেশে সহজলভ্য এতো মেয়ে থাকতেও যার জন্য যুবকরা এমন পাগল হয়, তাদেরকে অনেকটা বিশ্বসুন্দরীর মতো মনে করা হয়।

এ ব্যাখ্যা ম্যারী ও হাশেমের জানা। তবু নতুন করে তা শুনে ম্যারীর লাল মুখ আনন্দ ও লজ্জায় আরো লাল হয়ে উঠলো। আর হাশেমও তৃপ্তির ঢোক গিললো।

ক্রিষ্টিন আবার মুখ খুললো। বললো,

আরো আছে। যে ফুলে মধু থাকে বেশি, তাতেই সব ভ্রমর এসে ভীড় করে। জানো, ম্যারীর উপর কতো ভ্রমর বসেছে? তিরিশ জন, তাই না ম্যারী?

মুচকি হেসে তৃপ্তির অভিব্যক্তিতে ম্যারী বললো,

চল্লিশজন পর্যন্ত আমি হিসাব রেখেছি। এরপর আর হিসাব রাখিনি।

ক্রিষ্টিন বললো, শুনেছো তোমরা? আমি নিজে তো বিশ জন পার হতে পারিনি। এখন বুঝো, ম্যারী কতো আকর্ষণীয়া! আর হাশেম কতো লাকী!

এভাবে মজার মজার কথা চলছে। এমন সময় হাসান প্রসঙ্গ পাল্টে নিয়ে বললো,

হাশেম, সামনে একুশে ফেব্রুয়ারি। সে অনুষ্ঠানে 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করা আমার দায়িত্ব। সে কবিতার বইটা একটু দাও তো।

হাশেম বই আনতে যেতে চাইলো। কিন্তু ম্যারী একটু বিরক্তির সুরে হাশেমকে লক্ষ্য করে বললো,

চায়ের কাপগুলো এখনো এখানে পড়ে আছে। পরিষ্কার করা লাগবে না?

হাশেম কিছুটা অসস্তির সাথে গতি পরিবর্তন করে টেবিল পরিষ্কারে লেগে গেলো। আর তার বইয়ের শেলফ্ থেকে কবিতার বইটা নিয়ে আসার জন্য ইঙ্গিত করলো হাসানকে।

হাসান সেলফে বইটা খুঁজে পেলো। বইটাতে ময়লা পড়ে গেছে। হয়তো বছর বছর ধরে কেউ বইটি ধরেনি। সে সেখানে দাঁড়িয়েই এর পাতা উল্টাতে লাগলো। আর 'বিদ্রোহী' কবিতাটাও পেয়ে গেলো। এমন সময় সে অনুভব

করলো বইটা থেকে কী যেনো একটা জিনিস নিচে পড়ে গেছে। সে নিচে খুঁজে পেলো একটা পুরনো ছবি। ছবিটা হলো হাশেমের পূর্বের স্ত্রী সাহেরা ও তার ফুটফুটে পুত্র সন্তান শাহীনের। ছবিটা দেখে সে আনমনা-অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। অনেক স্মৃতি তার মনে ভেসে উঠলো। এই সেই বউ সাহেরা, যে না খেয়ে স্বামীর জন্য বসে থাকতো বিকেল পর্যন্ত। স্বামী অফিস থেকে ফেরার সময় হলে সেজেগুজে বাতায়ন খুলে পথের দিকে তাকিয়ে থাকতো চাতকের মতো স্বামীর অপেক্ষায়। স্বামী এলে লাজে শরমে দেহের পরশ দিয়ে স্বাগত জানাতো। স্বামীর মুখে খাবার তুলে দিতো। গরমে ফ্যানের নিচে হলেও পাখা করে দিতো স্বামীকে। আর এই হলো সে ছেলের ছবি যে বাবা ঘরে ফেরার সময় দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরতো। ছেলে জায়নামায এনে দিতো। বাবা ছেলে একসাথে নামায পড়তো।

আজ সে প্রেমের বউ নেই, ছেলে নেই, নামায নেই। হাসানের মনে পড়ে গেলো, শেষবার কানাডা আসার সময় এয়ারপোর্টের কথা। বিদায়ের সময় সাহেরা স্বামী হাশেমের দু'পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল আর বলেছিল,

আমাকে নিয়ে যান, আপনাকে ছাড়া আমি মরে যাবো।

শাহীনও কেঁদে কেঁদে বলেছিল, বাবা আমাকে রেখে যেওনা। হাশেম হেচকা ধাক্কা দিয়ে দু'জনকে সরিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল ইমিগ্রেশনের দিকে। যতক্ষণ তাকে দেখা গেলো, ততক্ষণ স্ত্রী ও ছেলের অশ্রুসিক্ত নয়ন তার দিকে তাকিয়ে রইল। হাসান বার বার পেছনে ফিরে এ দৃশ্য দেখছিল। কিন্তু হাশেম তাদের দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি। স্মৃতি ও কল্পনার অতল সাগরে হাসান ডুবে গিয়েছিল ক্ষণিকের জন্য। হাশেম তাকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলো,

কী রে, তুই কী করিস এতক্ষণ। এ ডাক শুনে হাসান তাড়াতাড়ি ছবিটাকে পকেটে লুকিয়ে নিলো। যেনো এক জীবনের স্মৃতিময় ইতিহাস তার পকেটে শামুকের মতো লুকিয়ে রইলো ।

যে বাড়িতে এ টি-পার্টি তা ব্যাংক লোন নিয়ে হাশেম ক্রয় করেছে তার বউয়ের নামে। হাশেম চেয়েছিল দু'জনের নামে বাড়ির দলিল করতে। কিন্তু ম্যারী তাতে রাজি হয়নি।

টি-পার্টি শেষ হলো সন্ধ্যার দিকে। মেহমানদেরকে বিদায় দিতে হাশেম দরজা পর্যন্ত এলো। এ মুহূর্তে হাসান একপাশে হাশেমকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, তোর আগের বউ ও ছেলের কী খবর?

হাশেম এমন প্রশ্ন শুনে একটু রাগান্বিত সুরে-ই বললো,

সেকেলে গেঁয়ো মেয়েটার কথা আর যেনো তোর মুখে কখনো না শুনি। তুইতো ম্যারীকে দেখলি। ম্যারীর রূপের সঙ্গে ওর তুলনা হয়? হয় না। তখন হাসান বললো, অনেক মিষ্টি তোমার বউ।

অত্যন্ত পুলকিত ও পরম তৃপ্তির সাথে হাশেমের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, আমার লাল বউ।

মাহমুদ রাশদান

অভ্যর্থনা জানাতে এসে এমন বন্ধু হয়ে যাওয়ার ঘটনা আমার জীবনে এই প্রথম। বাহরাইন এয়ারপোর্ট। এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদানের জন্য আসা। এয়ারপোর্টে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সাধারণত কোনো মহিলা বা মধ্যম পর্যায়ের অফিসার থাকে। অধ্যাপক পর্যায়ের কেউ থাকে না। কিন্তু বাহরাইনে ব্যতিক্রম পেলাম।

অধ্যাপক মাহমুদ রাশদান। ড. রাশদান বললে সবাই চেনে। কানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি। বাহরাইন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হিসেবে তাঁর অনেক নাম। অনেক তার গবেষণা ও প্রকাশনা। ব্যবহারেও অমায়িক। তিনি মোটেই নিজেকে জাহির করতে চান না। কিন্তু মেঘমালাও সূর্যকে আড়াল করে রাখতে পারে না। ঘন মেঘ ভেদ করেও আলো বেরিয়ে আসে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তো তেজদ্বীপ্ত আলোকরশ্মী উঁকি দেয়ই।

এয়ারপোর্টে তিনি হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে। সালাম-কালামের পর বললাম, তোমার পদমর্যাদার কাউকে এখানে আশা করিনি। তিনি বললেন, সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপকদের মধ্যে তোমাকে আমি নিজে বাছাই করে নিয়েছি। হেসে বললাম, তোমার মতো ব্যক্তিত্বকে কষ্ট দেওয়ার অপরাধী বানালে আমাকে! মনে হয়, তোমার উদ্দেশ্য ছিল সব চেয়ে বড় অপরাধীকে বেছে নেওয়া, আর মানুষ বানিয়ে ছাড়া। তাই না!

ড. রাশদানও হাসলেন। বললেন, তোমার এ বিনয়ই তোমার বড়ত্বের মাপকাঠি। তবে তা তো আগে জানতে পারিনি। এখন দেখলাম। আমি তোমাকে বাছাই করেছি অন্য কারণে। তুমিও অর্থনীতি নিয়ে কাজ করো, আমিও করি। আর

তোমার প্রকাশনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। মনে করলাম, একসাথে মতো বিনিময় করা যাবে, এই যা।

কথা বলতে বলতে গাড়ি এসে থামলো এক বাড়ির সামনে। বললেন, নামো।

মনের মধ্যে প্রশ্নটি আটকে না রেখে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, এ কয়দিন কি আমি এখানেই থাকবো?

তিনি মৃদু হাসি হেসে বললেন, এখানে থাকবে না। থাকবে পাঁচতারা হোটেলে। অন্য সবাইকে ওরা সে হোটেলেই নিয়ে গেছে। আমি তোমাকে আগে আমার কুঁড়েঘরে নিয়ে এলাম।

অনেক ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ দিওনা। বকা দাও। কারণ, অন্যান্য অতিথিরা পাঁচতারা হোটেলে উপাদেয় ডিনার খাবে। আর তুমি আমার সাথে আজ সাদামাটা খাবার খাবে। আজ রাতে তুমি আমার মেহমান। তুমি আমার সাথে আমার পরিবারের সাথে কিছু খাবে।

এ প্রাণের ছোঁয়া ও হৃদয়ের পরশের কাছে দুনিয়ার সব কিছু হার মানে। লিভিং রুমে বসলাম। তার স্ত্রী এসে সালাম দিলো। এলো এক ছেলে, এক মেয়ে। মা ও মেয়ের পোশাক অন্য রকম। পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত লম্বা ড্রেস। উপরের অংশটি হাতের কবজি পর্যন্ত প্রসারিত, যেখানে রয়েছে রঙ্গিন কাপড়ের ফুলেল ভাঁজ। মাথায় স্কার্ফ। শুধু চেহারাটা দেখা যায়। সবাই মনের ছোঁয়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো। অত্যন্ত শালীন ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। চারদিকে শান্তির হাসনাহেনা ছড়িয়ে আছে।

ড. রাশদান জিজ্ঞেস করলেন,

তুমি কি আগেও বাহরাইন এসেছো?

না, এই প্রথম।

আমি এ রকমই ভেবেছিলাম। তাই তো তোমাকে নিয়ে এলাম আমার বাসায়। এই ক'দিন আমি তোমাকে সঙ্গ দেবো, কাজেই প্রথমে আমার ব্যক্তিগত আপ্যায়ন তো তোমার পাওনা। এছাড়া বাহরাইনি মানুষের জীবন সম্পর্কে কিছুটা ধারণাও পেয়ে যাবে।

অনেক ধন্যবাদ। তার মানে, বাহরাইনিদের ঘরের জীবন কি এরকমই?

হ্যাঁ, অনেকটা এমনি।

পোশাক কি সবারই মোটামুটি এই ধরনের?

হ্যাঁ, মোটামুটি এমনই। ডিজাইনে পার্থক্য হতে পারে। তবে সবাই শালীন পোশাক পরে।

কিন্তু যেসব মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, বা চাকুরি করে, তারাও?

তারাও খোলামেলা চলে না।

লিভিং রুমে বসে চললো নানা ধরনের কথা। এর মধ্যে বাহরাইনিদের পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক কিছু জানতে পারলাম। ড. রাশদানের মেয়ে কিছু নতুন তথ্য প্রদানের উৎসাহ নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো, তুমি কি বাহরাইন মানে জানো? আর কেন এ দেশকে বাহরাইন বলা হয়, তা জানা আছে?

বলো শুনি, এর নাম বাহরাইন কেন হয়েছে।

সে প্রশান্তির হাসি হেসে বললো, আরবিতে 'বাহর' মানে সমুদ্র। বাহ্‌রাইন দ্বিবচন। মানে দুটি সমুদ্র। এজন্যই বাহরাইন বলা হয়।

তার মানে? এখানে দুটা সমুদ্র?

হ্যাঁ, তাই। তা-ই মনে করা হয়।

সেই দুই সমুদ্রের নাম কী?

এ নিয়ে অনেক কথা চালু আছে। কেউ নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারে না। তবে কেউ কেউ বলে, এখানে পূর্বে দু'টা সমুদ্রের মিলনস্থল ছিল। একটার পানি লোনা, আরেকটার পানি মিষ্টি।

বেশ মজার তো!

তথ্যগুলো জানাতে পেরে তার চোখে মুখে এক অদ্ভুত ধরনের আত্মতৃপ্তি ফুটে ওঠে।

এভাবে গল্প হলো। খাওয়া-দাওয়া হলো। জানা হলো অনেক। এমনকি

ভৌগোলিক বিষয়ও বাদ গেলো না। বাহরাইনের কোনোদিকেই অন্য কোনো দেশের স্থল সীমানা নেই। চারদিকেই পানি আর পানি। পারস্য উপসাগরের পশ্চিম তীর এলাকায় সৌদি আরবের পূর্বদিকে বাহরাইন দ্বীপ অবস্থিত। তেত্রিশটি ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দেশটির সব চেয়ে বড় দ্বীপের নাম বাহরাইন। রাজধানী মানামা।

রাত কাটলো পাঁচতারা হোটেলে। ড. রাশদানের কথা অনেকটা ঠিকই পেলাম। বাহরাইন উচ্চ আয় ও উচ্চ শিক্ষাহারের দেশ হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমা হাওয়া তেমন একটা লাগেনি। মক্কায়িত হাওয়া পানির শীতল পরশে মৃদু মন্দ বইছে গোটা দ্বীপটিতে। পাঁচতারা হোটেলের লবি, আতিথেয়তা ও বিনোদনেও শালীনতার ছাপ।

আড়াই দিন সেমিনার। এক অধিবেশন থেকে অন্য অধিবেশনের মাঝে তেমন বিরতি নেই। শুধু দুপুরেই বেশি বিরতি। এই কয়েকদিনের প্রায় সময়ই ড. রাশদান আমাকে সঙ্গ দিলেন। সেমিনারের বিষয় ছাড়াও অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, জিও-পলিটিক্সসহ অন্যান্য অনেক বিষয়েই আলোচনা হলো। বিশেষ করে বুঝা গেলো, ড. রাশদান আমেরিকার বৈদেশিক নীতির চরম বিরোধী। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার শক্ত মনোভাব হলো এই যে, প্রত্যেক দেশকে তার নিজ আদর্শে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া উচিত। এটাই গণতন্ত্র। এটাই স্বাধীনতা। অন্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এবং দাসত্ব না মানলে রক্তপাত ঘটিয়ে দেওয়া সভ্যতার পরিপন্থী। ড. রাশদান এ বিষয়টিকে বার বার তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। তিনি সেমিনারে বেশ কয়েকবার ফ্লোর নিয়েছেন। এমনকি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন আঙ্গিকের আলোচনায়ও তিনি যুক্তিকে সম্প্রসারিত করে এমন দিকে নিয়ে যান, যাতে এসব কথা বলা যায়।

হোটেলটির বার তলার উপর আমার রুম। অনেক বড় হোটেল। এতে কতো রুম আছে, তা জিজ্ঞেস না করলে অনুমান করাও কঠিন। উপরে হোটেল রুমে যাওয়ার জন্য সারি বাঁধা আটটা লিফ্ট। লিফ্টে নেমে লবি-ফ্লোরের ডান দিকে সেমিনার কক্ষ। অনেক বিষয়ে অনেক অধিবেশনের কারণে তিনটি বড় কক্ষে তিনটি সেমিনার যুগপৎভাবে চলে। সেমিনার রুমগুলো পার হয়ে রেস্টুরেন্ট।

সেমিনারে শেষদিন লাঞ্চ করলাম ড. রাশদানের সাথে। সেদিন রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে সেমিনার কক্ষের পাশে এসেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ফ্লাইট কবে?

কাল। দুপুরে।

Reconfirm করিয়েছো তো?

তার প্রশ্ন শুনে মাথায় বজ্রপাত হলো। গতকালই টিকেট Reconfirm করার কথা ছিল। এ কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, তাড়াতাড়ি টিকেট নিয়ে এসো। Reconfirm করাতে হবে। আমি এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। মাথায় একটি অস্থিরতা নিয়ে তাড়াহুড়া করে বললাম, আচ্ছা, যাচ্ছি। তুমি দাঁড়াও। আমি এক্ষুণি আসছি।

এ বলেই দৌড়ে গেলাম। লিফ্টে বার তলায় উঠে রুমে ঢুকে হুড়মুড় করে ব্যাগ খুললাম এবং টিকেটের খাপটি হাতে নিয়ে দৌড় দিলাম। বার তলায় লিফ্ট আসতে একটু সময় লেগে গেলো। কারণ, দুপুরের খাবারের পর ব্যস্ত সময়; সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজ নিজ হোটেল রুমে ফিরে যায়। বিশেষ করে সেমিনার শেষ হয়ে যাওয়ায় সবাই একটু বিশ্রাম নেবে। কাজেই প্রায় সব ফ্লোরেই লিফ্ট থামলো। যাক, নেমে গেলাম। আর টিকেট কক্ষে যাওয়ার পূর্বেই টিকেটটা প্রস্তুত রাখার জন্য খাপ থেকে টিকেট খুলতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু এ কী! খাপ আছে, টিকেট নেই। বুঝতে পারলাম না, কোথায় টিকেটটা পড়ে গেলো। দৌড়ে গেলাম লিফ্টে।

ব্যস্ত সময়, লিফ্ট পেতে দেরি হলো। রুমে গিয়ে তো আক্কেল গুড়ুম। রুমে টিকেট পাওয়া গেলো না। অস্থিরতা বেড়ে গেল, তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে দৌড়ে আবার ফিরে গেলাম লিফ্টের দিকে। লিফ্ট পর্যন্ত পথেও খুঁজে পাওয়া গেলো না। ভাবলাম, হয়তো লিফ্টের ভেতরে ছিটকে পড়ে থাকবে। কিন্তু তাড়াহুড়ার মধ্যে আটটা লিফ্টের মধ্যে কোনটি দিয়ে গিয়েছিলাম, বুঝতে পারলাম না। কাজেই যেটা পেলাম, সেটাই ধরলাম। কিন্তু পেলাম না। কাজেই মাঝে এক ফ্লোরে নেমে গেলাম। আরেকটা লিফ্ট পেতে বেশ দেরি হলো। এরপর দেখলাম, মাঝের আরেকটা লিফ্ট এসেছে। দৌড়ে তাতে গেলাম। কিন্তু এবারও হতাশ। এভাবে চার পাঁচটায় উঠলাম। কোথাও পেলাম না। ভাবলাম, হয়তো সবগুলো দেখতে হবে। কিন্তু মহাবিপদ। এ পর্যন্ত একটার পর একটা লিফ্টে সারি ধরে তল্লাশি করা হয়নি। কারণ, লিফ্টগুলো তো এভাবে সারি ধরে পাওয়া যায়নি। মাথায় ঘুরপাক খেলাম। এ পর্যন্ত চার পাঁচটা লিফ্ট খুঁজলেও কোন কোনটি খুঁজে দেখেছি, তার চিহ্ন রাখা যায়নি।

টিকেট না পেলে মহা বিপদ। টিকেট হারালে রিপোর্ট করতে হবে এবং তা গৃহিত হলে কখন ডুপ্লিকেট টিকেট পাওয়া যাবে, অথবা আদৌ পাওয়া যাবে কি না, তা-ও জানি না। কারণ, কখনো এ অভিজ্ঞতা হয়নি। এসব ভেবে মাথা ঘুরে গেলো। কাজেই নিচে বসে পড়লাম। কয়েক মিনিট পর আবার দাঁড়ালাম। এবার লিফ্টের একদিক থেকে শুরু করলাম। অবশেষে সপ্তম লিফ্টে গিয়ে খুঁজে পেলাম টিকেট।

এতক্ষণ হুলুস্থুল অবস্থায় ড. রাশদানের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এবার নিচে নেমেই উঁকি মেরে সেদিকে তাকালাম, যেখানে তাকে দাঁড়াতে বলেছিলাম। তাকে দেখতে পেলাম না। তাছাড়া এতক্ষণ তো তার দাঁড়িয়ে থাকার কথাও নয়। কাজেই দৌড়ে গেলাম টিকেটিং কক্ষে। ভাগ্যিস, তারা বন্ধ করে চলে যায়নি। কিন্তু এ কী বিপদ! ঠিক সময়ে টিকেট Reconfirm না করায় বুকিং কেন্সেল হয়ে গেছে। আমি অনুনয়-বিনয়ে নতুন করে বুকিং দিতে অনুরোধ করলাম। তারা বললো,

বসুন, চেষ্টা করি, তবে কোনো গ্যারান্টি নেই।

অপেক্ষার সময় যেনো কাটতে চায় না। তারপরও অসহায়ের মতো ব্যস্ত-উন্মত্ত চিত্তে অপেক্ষায় রইলাম। ভাগ্য ফিরলো সন্ধ্যা সাতটার দিকে। নতুন বুকিং পাওয়া গেলো। কারণ, একজন যাত্রী তার বুকিং কেন্সেল করেছে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। উথাল-পাতাল সমুদ্রের উচ্ছল ঢেউ যেনো নিমেষে শান্ত হলো। ফিরে গেলাম হোটেল রুমে। চরম উত্তেজনা ও ভীত-সন্ত্রস্ত ঘর্মাক্ত দেহে দাঁড়ালাম শাওয়ারের নিচে। বিশ-ত্রিশ মিনিট ধরে শীতল পানির নিচে দাঁড়িয়ে তবে কিছুটা শান্ত হলাম। পরে ধীরে সুস্থে কাপড় পড়ে ডিনারের জন্য রওনা দিলাম।

লবিতে নেমে টিকেটিং ঘর পার হয়েছি। এরপরই সেই স্থান, যেখানে ড. রাশদান দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করার কথা ছিল। এগিয়ে গেলাম সেদিকে। দেখলাম, ড. রাশদান সেখানে ফ্লোরে বসে আছেন। তার কাছে এগিয়ে গেলাম এবং আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এ সময় এখানে বসে কী করছো তুমি?

মুখে ভদ্রতার হাসিটুকু ছড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

কখন থেকে?

লাঞ্চের পর থেকে...যখন তুমি টিকেট আনতে গেলে আর আমি বললাম, আমি এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছি কি না, তাই বসে আছি।

তার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক আমি। যাকে বলে নির্বাক। মাথা ঝিমিয়ে উঠলো। কী করে তা সম্ভব? এতবড় একজন ব্যক্তিত্ব কিনা এতো দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করে আছেন আমার জন্য, ভেবেই নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগলো। আর আমার বিলম্বের কারণ খুলে বললাম।

তিনি শুধু বললেন, অপেক্ষা করার কথা দিয়ে কি চলে যেতে পারি?

প্যাট্রিসিয়া

Where is Pat?

Is she here?

Has she gone back?

Has she come?

এ ধরনের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা প্রশ্ন করে যাচ্ছেন হাসপাতালের বেডে শুয়ে অবশ অশতিপর এক বৃদ্ধ। পাঁচ দিন পূর্বে তার দেহে অস্ত্রোপচার হয়েছে। তিন দিন ছিলেন আইসিইউতে। দু'দিন পূর্বেই জেনারেল ওয়ার্ডে আনা হয়েছে। গত দু'দিন তার অবস্থা বেশি ভালো ছিল না। কখনো বেহুশ, কখনো নিদ্রা, আবার কখনো বা অর্ধনিদ্রায় কেটেছে।

আজ তিনি অনেকটা স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারছেন। বোধশক্তি ফেরা মাত্রই তিনি প্রশ্নের বাণ ছুড়তে থাকেন, প্যাট কই? সে কখন এসেছিল? এখন কোথায় গেলো? সে কি আমার মাথায় হাত বুলিয়েছে?

আমেরিকার পন্টিয়াক শহরের জেনারেল হাসপাতাল। বাংলাদেশি কামরুল সাহেব এই শহরেই একটা ভালো চাকুরি করেন। হঠাৎ করে সেদিন তার তলপেটে ভীষণ ব্যথা দেখা দেওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। পরীক্ষায় ধরা পড়েছে এপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা। জরুরি ভিত্তিতে অপারেশন করে রাখা হয়েছে ওয়ার্ডে। সে ওয়ার্ডের বাঁ পাশের বেডে আছেন কামরুল সাহেব, আর ডান পাশের বেডে এই অশতিপর আমেরিকান ভদ্রলোক। তার নাম হেনরী। কামরুল সাহেব হেনরীর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

প্যাট কে? তার কথাই বা বারবার কেন জিজ্ঞেস করছেন?

তুমি প্যাটকে চিনো না? সে আমার মেয়ে। পুরো নাম প্যাট্রিসিয়া। সংক্ষেপে প্যাট ডাকি। খুব ভালো মেয়ে। সেই শুধু আমার খবর রাখে। আর কে কোথায় থাকে আমি জানি না।

কেন আপনার বউ?

আমার বউ? আমি জানি না সে কোথায় থাকে। সেও আমার ঠিকানা জানে না।

কথাগুলো বলতেই বুড়োর গলাটা যেনো খানিকটা ভারী হয়ে গেল। তাই কামরুল সাহেব কিঞ্চিত সান্তনার সুরেই বললো, এ তো খুব খারাপ কথা। তা হলে শুধু প্যাটই খবর রাখে। সত্যি ভালো মেয়ে।

এখন সকাল নয়টা। হেনরীর সাথে কথা চলছে কামরুল সাহেবের। ইতোমধ্যে কামরুল সাহেবের স্ত্রী হাসপাতালে এসে উপস্থিত। সাথে তাদের ছোট ছেলে ও মেয়ে। তারা বাবাকে জড়িয়ে ধরলো। কামরুল সাহেবের স্ত্রী তার জন্য খাবার তৈরি করে এনেছেন। নিজ হাতে তা স্বামীর মুখে তুলে দিয়ে খাওয়ালেন।

হেনরী যেনো নির্জন সমুদ্রের নিঃসঙ্গতায় ডুবে গেছেন। তার অসার দেহটি জড় পদার্থের মতো বিছানায় পড়ে আছে। এমন সময় নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে কামরুল সাহেবের স্ত্রী একটু খাবার এগিয়ে দিয়ে হেনরীকে বললেন,

Please have something

আন্তরিকতার ছোঁয়ায় নিছক ভদ্রতা না দেখিয়েই হেনরী বলে উঠলেন, oh sure

এবার কামরুল সাহেব হেনরীকে বললেন,

তোমার স্ত্রী তোমার খবর না হয় না-ই নিলো, তোমার ছেলে নেই?

হ্যাঁ, আছে। বড় ছেলের নাম এ্যানথোনী। সে কোথায় থাকে, আমি জানিনা। তার বয়স যখন আঠারো তখন সে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে লিভ টুগেদার করতে চলে গেছে। আমি বারণ করেছিলাম। এ-ও বলেছিলাম যে, গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আমার বাড়িতেই থাক। কিন্তু সে চলে গেলো। পরের বছর অবশ্য সে 'ফাদার্স ডে'তে একটা কার্ড পাঠিয়েছিল। এরপর আর কোনো খরব নেই।

এতক্ষণে হেনরীর অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করে কামরুল সাহেবের স্ত্রীর একটু মায়া হলো। তাই তিনি চুপ করে থাকতে না পেরে দরদমাখা কণ্ঠে বলে উঠলো, আর কেউ নেই?

আছে আমার বড় মেয়ে ব্রেন্ডা। সে ভালো মেয়ে। সে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে চলে যাওয়ার পর, পরপর দুই বছর আমাকে ফাদার্স-ডে কার্ড পাঠিয়েছে।

এমন সময় কামরুল সাহেবের কয়েকজন বন্ধু এসে উপস্থিত। কেউ এনেছে ফুলের তোড়া, কেউবা কিছু ফলমুল, কেউ কিছু গিফ্‌ট। ততক্ষণে সেই ওয়ার্ডে ডাক্তার এসে উপস্থিত। তিনি রাউন্ড দিতে এসেছেন। ঘুরে ঘুরে অপারেশনের রোগীদের দেখছেন। সাথে নার্স ডাক্তারের নির্দেশনাবলি ফাইলে লিখছে। ডাক্তার হেনরীকে বললো,

আজ কেমন লাগছে?

হেনরী নার্সের দিকে তাকিয়ে বললেন, প্যাট কি এসেছিল? সে কি চলে গেছে?

ডাক্তারের রাউন্ড দেওয়া শেষ হলো। হেনরী একটু কাত হয়ে শুয়ে কামরুল সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখ একটু নড়ছে। কিছু যেনো একটা বলতে চাইছেন বুঝতে পেরে কামরুল সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কিছু বলবেন?

না, তবে হ্যাঁ, তুমি কি প্যাটকে দেখনি? সে কি আসেনি? সে কখন এসেছিল?

কামরুল সাহেব বুঝতে পারলেন, হেনরী তার মেয়ে প্যাটের জন্য অস্থির। হেনরীর এ অবস্থায় হয়তো বলা ঠিক হবে না যে, প্যাটকে তিনি আসতে দেখেননি। তাই তিনি বললেন,

হ্যাঁ, দেখেছি। প্যাট এসেছিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলাম বলে হঠাৎ মনে হলো, কোনো এক মহিলা চলে যাচ্ছে। প্যাটই হয়তো হবে।

খানিকটা স্বস্তির সাথে প্রফুল্লচিত্তে হেনরী এবার বলে উঠলেন, ঠিক ধরেছো তুমি। প্যাট না এসে পারেই না। হায়, কেনো আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? দুর্ভাগা আমি। আমি প্যাটকে মিস্ করলাম!

এমন সময় হাই-হিল জুতোর খটখটানি শব্দ করে এক মহিলা ঢুকলো। চোখে সান-গ্লাস। আড়ম্বরপূর্ণ বেশভুষায় মনে হল, যেনো কোনো পার্টিতে যাওয়ার পথে এখানে ঢুকেছে। তাকে দেখে হেনরী যেনো তার দেহের অস্ত্রোপচারের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। প্রাপ্তির শতভাগ বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে প্যাটের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, প্যাট, তুমি এসেছো? তুমি আসবে আমি জানি। তুমি এসে আমাকে না জানিয়ে কেন চলে গেলে? তুমি এখানে বসো। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।

হেনরী এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন। কামরুল সাহেব লক্ষ্য করলেন, কোনো প্রকার উদ্বেগ ছাড়াই অত্যন্ত শান্ত ও সাবলীলভাবে প্যাট বললো,

ড্যাড, আমি শুনেছি, তোমার অপারেশন হয়েছে। কিন্তু কাজের ঝামেলায় আসতে পারিনি।

তাতে কি প্যাট! তুমি আমার কাছে এসে একটু বসো।

অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে, এমন একটা ভাব দেখিয়ে তড়িঘড়ি করে বের

হয়ে যাবার আগে প্যাট শুধু বললো, আমি এখন বসতে পারছিনা। কারণটা তোমাকে খুলেই বলি। আমার বাসায় মেয়ের বান্ধবীরা আসবে তাদের বয়ফ্রেন্ডদের নিয়ে। পার্টি হবে। আমি শ্যামপেইন নিতে এসেছি।

চলে গেলো প্যাট। আর তার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন হেনরী।

বাইট্যা কুত্তা

ঘেউ ঘেউ ঘেউ।

বাথরুম থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ আসছে। দীপ্তি ব্যস্তত্রস্ত হয়ে সেই ঘেউ ঘেউ শব্দ কান পেতে শুনছে। কখনো সে বাথরুমের দরজায় কান লাগিয়ে শব্দের উৎস বুঝতে চেষ্টা করছে। কখনো সে দরজার কবজির ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। বুঝতে কষ্ট হচ্ছে কীসের এ শব্দ। ভেতরে তো কুকুর থাকার কথা নয়। কিছুক্ষণ পূর্বে সে নিজেই বাথরুমে ঢুকেছিল। কোনো কুকুর ছিল না সেখানে। এইমাত্র তার বর বাথরুমে ঢুকলো। ঢুকে দরজা বন্ধ করার সাথে সাথেই আওয়াজ ভেসে এলো ঘেউ ঘেউ।

দীপ্তি ও তার নব্য বিবাহিত স্বামী মন্টু বিশ্বাস। বাসর শয্যার তৃতীয় রাত আজ। অনেক কামনা ও বহু প্রতীক্ষার বাসর রাতগুলোতে কী যে ঘটছে, তা কল্পনা করতেও দীপ্তি উঠে শিউরে। কিছুক্ষণ পূর্বেও বাসর রাতের মাধুর্য উপভোগ করছিল নব এ দম্পতি। রোমান্টিকতার ক্লাইমেক্সে দীপ্তির দুচোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। মুহূর্তে দীপ্তি তার অবচেতন মনে অনুভব করলো এক অদ্ভুত অনুভূতি। স্বামীর যে দুটো পৌরুষ বাহু তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, তা যেনো রূপান্তরিত হলো কুকুরের হাড্ডিসার দুটি পায়ে। যেনো একটা কুকুর তাকে জড়িয়ে ধরে আছে। আর যেনো মাত্র তার স্বামী বাথরুমে ঢুকেছে, তখনি ভেতর থেকে ভেসে এলো ঘেউ ঘেউ শব্দ।

কিছুক্ষণ পর স্বামী বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। প্রথমটায় একটু দ্বিধার মধ্যে থাকলেও পরক্ষণেই দীপ্তি বাথরুমে ঢুকলো। সে বাথরুম তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলো, কোথাও কুকুরের কোনো চিহ্ন নেই। আর নেই কোনো ঘেউ ঘেউ

শব্দও। কী আশ্চর্য ব্যাপার। ভেবে ভেবে কোনো কূল-কিনারা পায় না দীপ্তি। অতঃপর আবার শুয়ে পড়লো তারা। রাত তখন প্রায় তিনটা বাজে। কিছুক্ষণ পর মন্টু আবার হুড়মুড় করে উঠে বসলো। এরপর লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে দ্রুত এগিয়ে গেলো বাথরুমের দিকে। এ হুড়মুড়িতে দীপ্তিরও ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আর অমনি বাথরুম থেকে আওয়াজ এলো ঘেউ ঘেউ। দীপ্তি আর তা সহ্য করতে পারলো না। সে সজোরে বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। মন্টু বেরিয়ে এসে বললো, তুমি বাথরুমে যেতে চাও? যাও।

দীপ্তি অপলক চোখে মন্টুর দিকে তাকিয়ে রইলো। এমন সময় হঠাৎ করেই মন্টুর গলায় কাশি আসে। সে দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। আর অমনি ভেসে এলো অনবরত ঘেউ ঘেউ শব্দ।

দীপ্তি এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝতে পারলো তার স্বামীর কাশীর শব্দই ঘেউ ঘেউতে রূপান্তরিত হয়। মন্টুর এ এলাহী কাণ্ড দেখে দীপ্তি তো হতবাক।

দীপ্তি অচিনপুরের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মৃদুল বাবুর মেয়ে। মৃদুল বাবু প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক। ঠকবাজী ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে তিনি সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। দুই ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে তাঁর স্বচ্ছল সংসার। তবে মৃদুল বাবুর এক শখ আছে। তিনি ঘরের কাজ করার জন্য অতি উদারভাবে অধিক বেতন দিয়ে সুন্দরী মেয়ে নিয়োগ দেন। তবে তাকে তিনি বেশি দিন রাখেন না। পুরোনা হয়ে গেলেই তার চাকুরি চলে যায়। এরপর ঘরে আসে অন্য আরেকজন। এভাবে দিন যায়, মাস যায়। আর বদলায় কাজের মেয়ে। শেষ পর্যন্ত এলো এক সুন্দরী যাদুময়ী মেইড। এই মেয়ে মৃদুল বাবুকে এতো বেশি আকর্ষিত করলো যে, পুরনো হয়ে গেলেও আকর্ষণের এতটুকু ঘাটতি এলো না। বরং দিনে দিনে মৃদুল বাবুর হৃদয়কে সে একেবারেই জয় করে নিলো। শেষ পর্যন্ত পরিচারিকার কক্ষ ছেড়ে সে স্থান করে নিলো মৃদুল বাবুর অন্দর ঘরে। তারই ঘরে জন্ম নেয় দীপ্তি।

মন্টুর বাড়ি এক অজ পাড়াগায়ে। বাবা কমল বিশ্বাস ছিলেন কৃষিবিভাগের নিম্নমানের কর্মচারি। তারই ঘরে জন্ম নেয়া সন্তান মন্টু বিশ্বাস। মন্টুর লেখাপড়ার বয়স হওয়ার পূর্বেই কমল বিশ্বাস মারা যান। এরপর তার ভাতিজা মুকুল নিজ খরচে মন্টুর লেখাপড়া ও লালন-পালনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু মন্টু তার প্রতি এ সহযোগিতা স্বীকার করাকে লজ্জা বলে মনে করলো। এমনকি সে মনে মনে

মুকুলের প্রতি প্রবল পরশ্রীকাতরতা লালন করে। প্রতিযোগিতায় তাকে হারিয়ে দেয়ার সংকল্প গ্রহণ করে।

মন্টু লেখাপড়া শেষ করার পর মুকুলের প্রতিষ্ঠানেই চাকরি গ্রহণ করে সেখানে পুকুরচুরি করতে থাকে। শুধু তাই নয়, সে মুকুলকে নাজেহাল করার জন্য এক পাগলা কুকুরও পালন করে। যখনই মুকুল ঘর থেকে বের হয়, তখন মন্টু সেই পাগলা কুকুর লেলিয়ে দেয়। আর কুকুরটি করতে থাকে ঘেউ ঘেউ। এক পর্যায়ে সে মুকুলের গোটা প্রতিষ্ঠানটিকেই গার্মেন্টসের কর্মচারি ও লাঠিয়াল দলসহ দখলের চেষ্টা করতে দ্বিধাবোধ করেনি।

মন্টুর বাড়ি গ্রামে হলেও তার বিয়ে হয় শহরে। গ্রামের অনেকেই তার বিয়েতে যোগ দিতে পারেনি। বিয়ের পরও সে স্ত্রীর সাথে ঢাকায়ই আছে। সে কারণে দীপ্তি শ্বশুরবাড়ির আমেজ এখনো পায়নি। সেই সমাদর পেতে অন্য যেকোনো মেয়ের মতো দীপ্তির মনেও আকুতি নেই তা নয়। সে চাপা উত্তেজনা তার মনেও আছে, এ কথা বলা যায়। কিন্তু সে তার স্বামীর নিকট তা প্রকাশ করতে পারেনি। আজ স্বামীর পাশে শুয়ামাত্রই এর শুভ সূচনা হলো। মন্টু বললো, তোমাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি যাওয়া হয়নি। সবাই বলছে তোমাকে নিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য। কিছু দিনের মধ্যেই যেতে চাই।

নতুন শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথা শুনে দীপ্তির দেহমন আনন্দে নেচে উঠলো। শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-দেবর ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সামনে সে উপস্থিত হবে ঘোমটা পরে। সবাই নয়া বউয়ের দিকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে তাকাবে। সেই কল্পনায় লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠলো। যদিও পাশে শুয়ে রাতের আঁধারে তার স্বামী তার সে মধুর রূপটি দেখতে পেলো না। মন্টু বললো: কি, তুমি যে চুপ করে আছো? কিছু বলো!

দীপ্তি লাজুক কণ্ঠে শুধু বললো, পতিভক্তি পত্নীধর্ম।

শুক্র ও শনিবার তো ছুটিই, মন্টু অফিস থেকে আরো দু'দিন ছুটি নিলো। এভাবে সে মোট চারদিন পেলো। কাজেই শুক্রবার সকালেই মন্টু তার নতুন বউ নিয়ে বাড়ি রওনা হলো। সাথে আছে মন্টুর দুজন বন্ধু ও দীপ্তির এক বান্ধবী। বাড়ি পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দীপ্তি ভেবেছিল, সন্ধ্যায় হয়তো কেউ তাকে দেখতে আসবে না। কিন্তু গাঁয়ের কৌতুহলী মানুষের ব্যাপারে তার ধারণা আর কতটুকু। শহর থেকে আসবে নতুন বউ। সবার মনে কৌতুহলের সীমা নেই।

গাঁয়ে বধূবরণ বড় মজার। দীপ্তি নামের নয়া বউটি বাড়ির উঠানে গিয়ে দাঁড়ালো। আর তাকে কোলে করে উঠানো হলো ঘরে। এরপর চারদিকে কৌতুহলী চোখের দৃষ্টি। সব দৃষ্টির একটাই কেন্দ্রবিন্দু। লজ্জায় বউ সাজে সাজানো দীপ্তির রক্তিম মুখ আরো লালচে হয়ে উঠলো। গায়ের নয়া বউয়ের গায়ে এমন দামী রঙ্গীন পোশাক থাকে না, থাকে না এতো সাজ। কাজেই এমন সাজে শহুরে বউকে দেখে গায়ের কৌতুহলী মেয়েরা যেনো হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

কেউ কেউ জীবনের প্রথম এমন সাজ দেখে মন্তব্যও করছে। প্রথমে দীপ্তি একটু ঘাবড়ে গেলেও তাদের এমন কৌতুহলকে উপভোগ করছে এবং মনে মনে পুলকিত হচ্ছে। এমন সময় বাঁ দিকের এক কোন থেকে দীপ্তি শুনতে পেলো,

দেখছো, বাইট্যা কুত্তার বউটা কত্তো সুন্দর!

এ মন্তব্য শুনে দীপ্তির মুখ চোখ বিমর্ষ হয়ে গেলো। দীপ্তির সব তৃপ্তি যেনো নিমেষে মাটি হয়ে গেলো। সে আঁড় নজরে বারে বারে সে মন্তব্যকারীর দিকে তাকিয়ে তাকে চিনে নিলো।

এ কথার অর্থ কী, তা ভাবতে ভাবতে রাতে দীপ্তির ঘুম হয়নি। সকাল হতেই সে রাতের চিনে রাখা মেয়েটিকে মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সকাল পার হলো, দুপুর গড়ালে শেষ পর্যন্ত বিকেলের পড়ন্ত বেলায় দীপ্তি তার দেখা পেলো। তখন সে তাকে বললো, এই যে তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

কন বউদি।

এখন না। আমি নির্জনে বলতে চাই।

আইচ্ছা।

রাতে দীপ্তি তাকে একাকী বাইরে নিয়ে তার মন্তব্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো। সে জবাবে বললো,

আমি তো ঠিহই কইছি। আপনে বহুত সুন্দর, তাই তো আমি আপনেরে সুন্দর কইলাম।

না, তা না। তুমি তো অন্য কিছুও বলছিলে। তাই জানতে চাই।

আপনারে আমি খারাপ কই নাই। আপনারে ভালাই কইছি। কে কইলো, আপনারে আমি খারাপ কইছি?

না, না, আমি সে কথা বলছি না। তুমি আরেকটা কথা বলেছিলে, 'বাইট্যা কুত্তা' এমন একটা কিছু।

ও হেই কতা! তা কইছি। এর একটা কাহিনী আছে।

বলো না! আমি তাই শুনতে চাই।

কথাটা কইতে কেমন লাগতাছে। না কইলে হয় না?

না, বলো। আমি শুনতে চাই।

তা হইলে হুনেন। একবার মন্টু বাড়িত আইছিল।

তারপর! বলো, বলো।

সন্ধ্যা রাইতে মন্টুর দুই সহপাঠী আইসা তারে বুঝায়। বলে, যেনো মুকুল তোমারে লেহাপড়া করাইলো, বড় বানাইলো, তুমি তার পেছনে কুত্তা লাগাও। এইডা ঠিক হইতাছে না। কথাডা মন্টুর ভালা লাগলো না। সে যেনো চিল্লাইয়া উঠলো। ঘেউ ঘেউ কইরা উঠলো। ঘেউ ঘেউ কইরাই এক লাফ দিয়া সে ঘর হইতে বাইর হইয়া গেলো। ঘেউ ঘেউ করতে করতে সে যেনো অন্ধকারে হারাইয়া গেলো। খুইজ্যা পাওয়া গেলো না। তারপর অনেক রাইতে দরজার বাইরে এক রকম আওয়াজ হইল। তা শুইন্যা ঠাকুর দা কইলো, দেখো তো, মন্টু আইছে মনে হয়।

তখন তার আরেক দাদা দৌড়াইয়া গেলেন। ঘরের দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি মাইরা দেখলেন। বারে বারে ভালা কইরা দেখলেন। কিন্তু যারে খুঁজতাছেন, তারে পাইলেন বইল্যা মনে অইল না। তিনি দরজার কাছে থেইক্যা ফিরা আইলেন আর কইলেন,

মন্টু তো আহে নাই। এইডা তো একটা বাইট্যা কুত্তা।